অসংলগ্ন কাব্য

অসীম রায়

'Asanlagna Kabbya'
'Ashim Roy'

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA
550-16
4.4.14

প্রাইমা পাবলিকেশনস
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯

প্রকাশক

নারায়ণ সেনগুপ্ত

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

নিরঞ্জন বসু

নর্দার্ন প্রিণ্টার্স

৩৪।২ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

গীতাকে

For Gita

লেখকের অন্যান্য বই—

একালের কথা

গোপালদেব

দ্বিতীয় জন্ম

রক্তের হাওয়া

দেশদ্রোহী

শব্দের খাঁচায়

অসীম রায়ের গল্প

[illegible] গল্প

[illegible]

Talk to me of originality and I will turn on you with rage. I am a crowd, I am a lonely man, I am nothing.'

—W. B. Yeats

যখন নয়াদিল্লীতে শুধু বিদেশী ব্যবহৃত গাড়ি কিনবার জন্যে নয়, বিদেশী-বিদেশিনীদের পরিত্যক্ত বাথটাব কিংবা আণ্ডারওয়ার কিনবার জন্যে কিউ লাগে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী মহলে, এবং দিগ্‌বিজয়ী বামপন্থী নেতা ময়দানে বিপ্লবের আগুন ছিটিয়ে নিজের ছেলেকে পাঠান বিদেশে এই বিপ্লবের আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে, তখন একথা মনে না হয়ে পারে না যে যাঁরা এক মহৎ কবিতা বাস্তবে পরিণত করার জন্যে আমার চোখের সামনে জীবন দিলেন অথবা তার চেয়েও কোন ভয়ঙ্কর ভবিতব্যের পথে ধাবিত হলেন তাঁদের সেই কাহিনী, অথবা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে একজনের কাহিনী, যাকে আমি চিনতাম জানতাম ভালবাসতাম, না বললে আমার জীবনের সামান্য সার্থকতা নেই।

অবশ্য এটুকু পর্যন্ত লিখেই আমার হাত কাঁপছে আত্মবিশ্বাসের অভাবে কারণ শক্ত কাহিনী লিখতে শক্ত কলমের প্রয়োজন। আমি বংশী মিত্তির, বি, এস-সি প্লাকড ; পলিথিন কারখানার সুপারভাইজারি করে জীবনের আটাশ বছরের মধ্যে বহুমূল্য আটটা বছর কাটিয়ে দিয়েছি এবং পঞ্চান্ন বছরে রিটায়ার করা পর্যন্ত বোধহয় এইভাবে ভোর ছটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধে ছটায় বাড়ি ফিরব। আমি জানি আমার পক্ষে এ কাহিনী লিখবার চেষ্টা উন্মাদ-আলয়ের দেয়ালে দেয়ালে কয়লা দিয়ে বাক্য গাঁথবার প্রচেষ্টার মতো। একথা স্বাভাবিক বিনয়বশত বলছি না। কারণ এ কাহিনী গাঁথবার শিক্ষা অথবা যাকে বলে সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউণ্ড যেমন নেই তেমনি আমার মধ্যে মানসিক শৃঙ্খলার প্রবল অভাব। এ কাহিনী অসংলগ্ন হতে বাধ্য। সেই ধাপে ধাপে কোন কিছু গড়ে তুলবার মানসিকতা আমার নেই। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস গজিয়েছে, বোধহয় গত দু-তিন বছরের অভিজ্ঞতায় নিজেদের কুরে কুরে, চেখে চেখে চেটে চেটে যে, আমাদের কালের মহৎ কবিতা বোধহয় অসংলগ্ন হতে বাধ্য।

আর একটা কারণও এক অপ্রতিরোধ্য বেগে আমাকে এপথে ঠেলে দিচ্ছে, আমার হাতে কলম তুলে দিচ্ছে আমারই অযোগ্যতা, এই লেখার মধ্যে দিয়ে আমার লেখক না হওয়ার সংকল্প। কারণ গত আট দশ বছরে আমার চারপাশের জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাংলা গল্প উপন্যাস জগতের চেহারার এত বিরাট ফারাক যে আমার এ বই যদি কখনও শেষ করতে পারি (যে সম্পর্কে আমার সন্দেহ যথেষ্ট) তাহলে' এই বাঙালী লেখকের পংক্তিতে দাঁড়ানো আমার কাছে এক সর্বনাশ ছাড়া কিছু নয়। কারণ তাহলে সেই প্রশংসার ফেনা-আছড়ানো পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে এটুকু বুঝতে কাণ্ডজ্ঞান আমার নিশ্চয় অবশিষ্ট থাকবে যে আমি ব্যর্থ, কারণ চারপাশের অভিজ্ঞতার চেহারা আমি ধরতে পারি নি।

যৌবনের প্রথম থেকেই আমার কাছে কমিউনিজম বিশ্বের এবং নিশ্চয় আমাদের দেশের প্রধান ঘটনা। কমিউনিজমের জয়যাত্রা যে পার্টি ত্বরান্বিত করেছে আমি সেই পার্টির দিকে হাত বাড়িয়েছি, যে লেখক এই জয়যাত্রায় পথের আবর্জনা সরাতে চেষ্টা করেছে তার লেখা পড়তে চেষ্টা করেছি। এইসব করেছি আমার রাজনৈতিক কাজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা যথাযথ সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউণ্ড ছাড়াই। পলিথিন কারখানার সুপারভাইজারি করে করে আমি একদিকে লেনিন স্তালিন মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারার সান্নিধ্যলাভ করেছি তেমনি বুর্জোয়া জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদের কিছু কিছু রচনার সঙ্গে এবং সমাজবাদী জগতের শিল্প ভাবনার সঙ্গেও যোগসূত্র স্থাপনে তৎপর হয়েছি। এবং এসবই সম্ভব হয়েছে একটি মাত্র লোকের জন্যে যে এ কাহিনীর নায়ক।

সূর্য (স্থানীয় পুলিশের খাতায় সোনা, হাসপাতালের তালিকায় সুগত) সাম্যবাদের এমন এক ব্যাখ্যা দিয়েছিল যা অন্তত কোন বইতে পড়ি নি। 'এটা মনে রাখবেন, সাম্যবাদ মানে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নয়, ওটা নিশ্চয় দরকার, কিন্তু লক্ষ্য হল গোটা মানুষটাকে পাল্টে দেওয়া। এই যেমন,—' আমাদের বাড়ির দোতলা ঘরখানার জানালা

দিয়ে গঙ্গা পর্যন্ত যে রাস্তাটা গিয়েছে সেদিকে তার লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে সে বললে, 'ঐ পোড়ো মন্দিরটার গায়ে প্লাইউডের কারখানার সামনে যে দুটো হিন্দুস্থানী মুটে বসে আছে, সাইকেলের দোকানে যে ছোকরা মাডগার্ডে রঙ বোলাচ্ছে, যে লাল শাড়িপরা মেয়েটা লজিক মুখস্থ করে ঘামতে ঘামতে দৌড়চ্ছে কলেজের দিকে, এমনকি ঐ গঙ্গাস্নান ফেরতা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—এরা কেউ একা নয়। এদের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড যোগসূত্র আছে। সাম্যবাদ আমাদের এই যোগসূত্রটা আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান জানাচ্ছে। শুধু একলা প্রাণের বেদনার তীব্রতা নয়, শেষপর্যন্ত নিজেকে কুরে কুরে খাওয়া নয়, সাম্যবাদ একটা বিরাট কোরাস, একটা উৎসব। এ উৎসবে আমাদের সবাইকে যোগ দিতে হবে।'

বলবার সময় সে খুব স্বাভাবিকভাবে বলত গলার স্বর না চড়িয়ে, হেসে, থেমে থেমে। আর যে শব্দ খুব চালু এবং বহু ব্যবহারে যাদের গায়ের শাঁস উঠে গেছে সেগুলো সযত্নে পরিহার করে অথবা ব্যবহারে অভিনবত্ব এনে। তার ছোট দুভাই, আরুণি ও উপমন্যু যাদের মধ্যে একজন জেলে পুলিশের গুলিতে মৃত, তাদের প্রকাশভঙ্গী আমার পছন্দ ছিল না। দাদার নেতৃত্বেই তারা পার্টির কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছে কিন্তু তাদের প্রকাশভঙ্গী আমার মনে কোনরকম সাড়া জাগাত না। তারা তাদের বুলেটিনমুখস্থ বাক্যগুলো সময়ে অসময়ে পাত্রে অপাত্রে ঢেলে দিত। তাদের বাক্যগুলো অন্তত আমার মনে প্রতিধ্বনি তুলত না, কিন্তু এই সব কথাই তাদের দাদা বলত অন্যভাবে যাতে দেশের বেশীর ভাগ শ্রমজীবী সংবেদনশীল মানুষের গত্যন্তর থাকে না তার পথে না চলে। এমন প্রগাঢ় আকর্ষণী শক্তি সে পাড়ায়, অফিসে কারখানায়, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ছড়িয়েছিল যে তার বিরুদ্ধপক্ষও আকৃষ্ট হত তার দিকে। আর আমি তার আবির্ভাবের দিকে চেয়ে থাকতাম ভয়-মিশ্রিত আনন্দে, কিছুটা উৎকণ্ঠায়।

সূর্য ব্যানার্জি সম্পর্কে উৎকণ্ঠা আমার অনেক দিনের, তার ছেলে-বেলার একটা ঘটনা আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি। এ

অঞ্চলের একজন বিখ্যাত গুণ্ডা যিনি পরে মন্ত্রী অথবা ঐ রকম কি একটা হয়েছিলেন তাঁর জুলুমের প্রতিবাদে তের বছরের সূর্য তাঁর ডেরায় চড়াও হয়ে তাঁকে শাসিয়ে আসে। স্তম্ভিত ভক্তদের একজন চেঁচিয়ে ওঠে, 'বলুন, ছোঁড়াটার নলি টিপে দিচ্ছি এখনই' কিন্তু সেই বিখ্যাত লোকটিও মুগ্ধ হয়েছিলেন এই টিংটিংয়ে ছোকরাটির পাড়া সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক ক্রোধে, তার সংযত কিন্তু দৃপ্ত বাক্য ব্যবহারে। তিনি মুগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'বাঘের বাচ্চা! ওর পাড়া দিয়ে তোরা হাঁটবি না।' তারপর সূর্যর দিদির পেট বানিয়ে যখন পাড়ার শ্যামলদা সটকাবার তাল করছিল তখন তাকে ঘাড় ধরে সে একদিনে তার দিদির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। তখনও বোধহয় সে কুড়িতে পড়ে নি। একবার লোকাল ট্রেনে দুর্বিনীত এক কাবলীওয়ালা যখন যাত্রীদের উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও কামরার মধ্যেই ক্রমাগত থুতু ফেলে যাচ্ছে কারুর তোয়াক্কা না করে, তখন এক কোণ থেকে উঠে এসে তালপাতার সেপাই তরুণটির ক্রমাগত থাপ্পড়ে হতভম্ব বিশাল লোকটির পরের স্টেশনেই কামরাত্যাগ এ অঞ্চলের বহু-আলোচিত ঘটনা।

কিন্তু এক পরাক্রান্ত কিংবদন্তীর নায়করূপে সূর্য আমাকে ধরে রাখে নি। মানুষের দেহ ভঙ্গুর একথাটা আমার আটাশবছরের জীবনেই সম্যক উপলব্ধি করতে পারছি শুধু নিজের দিকে চেয়েই নয়, অসামান্য স্বাস্থ্যের অধিকারিণী আমার মায়ের গত বছর পক্ষাঘাত এই প্রাচীন সত্যটার দিকে আমার ঝুঁটি ধরে ঠেলে দেয়। বাস্তবিক, মানুষের জয়যাত্রা তার ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও, তার প্রবল নশ্বরতাই তাকে এক অপূর্ব অমরত্ব দান করেছে—এও আমার বন্ধু, আমার নায়কের কথা। বোধহয় কোন চিঠির লাইন কোট্ করছি। কারণ গত কয়েক বছরে তার অস্তিত্বের সঙ্গে আমার অস্তিত্ব এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে যে বলতে কি আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি। এখনও, যখন আমি তার কাছ থেকে অনেক দূরে, এখনও সে সূর্যের আলোয় আমি স্নিগ্ধ।

এ পর্যন্ত যা লিখেছি তাতেই আমি নিশ্চিত, কিছুই হচ্ছে না। আমি আগেই বলেছি এ কাহিনী লেখার মতো মানসিকতা আমার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অর্থাৎ এ কাহিনী গড়তে গেলে ধীরে ধীরে ইঁটের পর ইঁট গাঁথবার যে স্থাপত্য কৌশল তা আমার একেবারে অনায়ত্ত। আমি একসঙ্গে হড়বড় করে অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছি, কোন প্রস্তুতি না করেই আমার মা, সূর্যের ভাইবোনের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছি। এ কাহিনীর অসংলগ্নতা তাই অনিবার্য। তা ছাড়া একটু শারীরিক ক্লান্তিও যে নেই তা নয়। আগামীকাল ভোর ছটাতে বেরিয়ে ট্রেনে চেপে কারখানা গেটে সাতটাতে হাজিরা দেওয়ার রুটিনের ভবিতব্য যখন আরও অন্তত বিশবছর জুড়ে তখন একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়াই বোধহয় ভাল। বেশী রাতে আলো জ্বললে মা নীচ থেকে উঠে আসতে পারেন, নিঃশব্দ প্রতিবাদের মূর্তি ধরে বিছানায় বসে থাকতে পারেন—এ সমস্ত চিন্তাও আমার এ কাহিনীরচনার পেছনে কাজ করে চলেছে, চলবে। কিন্তু এগুলো সব মেনে নিয়েছি। আমার অক্ষমতা, পারিবারিক দৈন্য, লেখা শেষ না করার প্রবল অনিশ্চয়তা এ সব কিছুই এক অর্থে আছে, আবার নেই। আরও কোন সক্ষম, পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল মানুষ যদি এ কাজে হাত দিতেন তাহলে আরও ভাল হত নিশ্চয়। কিন্তু পঙ্গুও পর্বত লঙ্ঘন করবে এইটাই আমাদের কালের দাবী মানুষের কাছে। একথাটাও অবশ্য আমার বন্ধুর।

২

সাদা ধবধবে চুনকাম-করা পাঁচিলের মাঝখানে একটা পাল্লা খোলা গেট। ঢুকবার আগে সিগারেট ধরাই। প্লাণ্টের মধ্যে ধূমপান নিষেধ কিন্তু আমি যে অংশে কাজ করি সেই সেনট্রাল ল্যাবরেটরীতে পৌঁছতে পৌঁছতে সিগারেট শেষ হবে। পাকা দশ মিনিটের পথ। আশেপাশে মানুষের পা হাত। চাপা বিজয়োল্লাস কারুর চোখে মুখে। গতকাল সাড়ে তিনমাস পূজো বোনাসের ঘোষণার সঙ্গে এ-উল্লাসের যোগাযোগ স্পষ্ট।

খানিকদুর এগিয়েই আমাদের ক্লোরিন ইউনিট। এটা আমাদের আদি কারখানা। বোধহয় শতবর্ষপূর্তির উৎসব হবে কয়েক বছরের মধ্যেই। কারখানার দেয়ালে চিমনিতে মান্ধাতা আমলের গন্ধ। সামনে ক্লোরিন ইউনিটের কেয়ারটেকার বোসবাবুর বিউটিফিকেশান প্রোগ্রামের অন্তর্গত দুটো শূন্য ফুলের বেড, কাঠিতে পোঁতা স্টিকার 'ফুল ছিঁড়িবেন না'। সেদিকে আধখাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে দিতেই কানে এল, 'কিন্তু এমন কিছু ভিকৃটি্রর জন্যে আমরা কাজ করব না যার সঙ্গে টাকা পয়সার কোন যোগ নেই?'

সূর্য বানার্জির গলা। আমি কান খাড়া করি।

'দেখুন, টাকা পয়সার সঙ্গে যোগ নেই এমন কিছু নেই পৃথিবীতে, ব্যানার্জিবাবু। জন্ম মৃত্যু বিবাহ সবই টাকার জন্যে। টাকার জন্যেই বিপ্লব। মানে, সাধারণ মানুষকে তো খেতে হবে, পরতে হবে।'

রমেনের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। অঙ্কে তার একদা খুব মাথা ছিল। সেনট্রাল ল্যাবরেটরীতে তার কাজের তারিফ হয়েছিল। ওয়ার্কশপের ম্যানেজার মিস্টার পোচখানেওয়ালা পর্যন্ত তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। লোকটাকে কিন্তু আমি ঘেন্না করি।

'আমি ঐ তর্কের মধ্যে যাচ্ছি না রমেনবাবু, যদিও টাকার জন্যেই বিপ্লব একথা কখনও মানি নি মানব না, কিন্তু এমন কিছু করা যায় না,

ভাবা যায় না, যার সঙ্গে আমাদের কারখানার পাঁচিলের বাইরে যে দেশ বলে একটা বস্তু ছড়িয়ে আছে তারও যোগ রয়েছে ?'

'বিপ্লব ?' রমেন তার বিশাল শরীরখানার গতি যেন ব্রেক কষে থামিয়ে দেয়। আমিও দুহাত পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ি। চারপাশের শরীরগুলোর গতিও মন্থর হতে থাকে।

পিচের রাস্তাটা মোড় ঘুরতেই আমাদের রাবার কেমিক্যাল ইউনিট। পোচখানেওয়ালার গাড়ির হর্ণ। আমরা সরে দাঁড়াই।

'আচ্ছা, রমেনবাবু, পরে কথা বলব।' রমেন এগোতেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সূর্য বললে, 'ছুটির পর থাকবেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।' তারপর রাবার কেমিক্যাল কারখানার দিকে তার লম্বা হাল্কা শরীরখানা এগোতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের লোক-জনের হাত তুলে, কখনও সরবে, সম্ভাষণ। পূজো বোনাসের লড়াইয়ের অবিসংবাদিত নেতা যে সূর্য ব্যানার্জি এ কথাটা চাপা থাকেনি। রমেন সেন প্রেসিডেণ্ট কিন্তু সূর্য ব্যানার্জি আসল নেতা, সাহেবদের সঙ্গে প্রত্যেক পাঞ্জাকষায় সে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়েছে, কখন রাশ টানতে হবে, কোন মুহূর্তে আঘাত করতে হবে তার মোসাবিদা করে দিয়েছে সে, অনেক আগে থেকেই। আর এই নেপথ্য নেতার কাহিনী যে কর্মীদের শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করেছে তাই নয়, প্ল্যাণ্ট ম্যানেজার পর্যন্ত একথা ছড়িয়েছে। পোচখানেওয়ালার সঙ্গে আমার একটু আলাপসালাপ হয় মাঝে মাঝে। লোকটার জীবনে একমাত্র সমস্যা, তার স্ত্রী ঘন ঘন ফার্নিচার কেনে আর বদলে ফেলে, এই প্রসঙ্গে মহিলা মানসিকতা নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা প্রায় হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই ভদ্রলোকই গত সপ্তাহে হেড অফিসে বোনাস এগ্রিমেণ্ট সই করবার মুখে আমাকে খুব একটা চাপা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে সে ব্যানার্জির ট্রান্সফার সুপারিশে উৎসাহী : আর এক্ষেত্রে ট্রান্সফার মানে প্রমোশন, এটা আমাদের কারখানার অভিজ্ঞতা। ব্যানার্জির র‍্যাংকিং আর এক ধাপ বাড়বার ইঙ্গিতও ছিল সে সুপারিশে।

সেদিন ল্যাবরেটরীতে পলিথিন শিট্ টেস্ট করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। হাইভোল্টেজে চাপিয়ে প্রেশার রেগুলেট করে আমি যান্ত্রিকভাবে চেয়ে থাকি হাল্কা সূক্ষ্ম পলিথিন শিটগুলোর দিকে। রমেনের সঙ্গে এ নতুন তর্কের সূত্রপাত যে সোনা মিছিমিছি করে নি তা আঁচ করতে পারছিলাম। তার পার্টি থেকে যে নতুন নির্দেশ এসেছে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে এ কি তারই ইঙ্গিত? তার মানে আবার রমেন সেনের সেই গালফোলা কথাবার্তা। 'আমরা যারা নেতা তারা আপনাদের ঠিকই বলেছি, আমাদের ওপরেই পরিচালনার দায়িত্ব এবং আমরা সেই দায়িত্ব ঠিক ভাবেই পালন করেছি।' গেট মিটিং-এ তার এই আশ্চর্য আত্মতৃপ্ত মানবিকসম্পর্ক বিরহিত গলামোটা আওয়াজে আমার গা জ্বলে উঠেছিল কয়েকদিন আগেই। রমেন সেন মানে একটা প্রকাণ্ড হৈচৈ, এক প্রবল হল্লাব স্রোতে আমাদের চারটে ইউনিটের বেশীর ভাগ মানুষকে কোনরকমে ঠেলে ফেলে দিয়ে পারে দাঁড়িয়ে সে হাততালি দেবে, এইটাই রমেন সেনের ইমেজ আমার চোখে। গত এক বছরে সোনার প্রভাব যখন তার রাবার কেমিক্যাল ইউনিট ছাড়িয়ে আরও তিনটে ইউনিটে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে তখন থেকেই মনে হচ্ছিল একটা মোড় নিচ্ছে আমাদের ইউনিয়ন পলিটিক্স।

ক্যান্টিন থেকে একটু দেরী করেই ফিরলাম। মনের মধ্যে কেমন একটা ভাব চাপ হয়েছিল। এতদিন পর কথার আওয়াজ থেকে রাজনীতি বেরিয়ে আসছে এরকম ধারণা হচ্ছিল আমাদের মতো কিছু কর্মীদের। বিশেষ করে বামপন্থী নেতাদের বক্তিমা যা বোজ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দৈনিক কাগজে আত্মপ্রকাশ করে তার প্রচণ্ড ব্যর্থতা সম্পর্কে আমরা ক্রমশ সজাগ হয়েছিলাম। সোনা, আমি, কারখানায় আমাদের সমবয়সী টেকনিকাল হ্যাণ্ড, কেরাণী, পিওন সবাই কলকাতায় শহরতলীতে এইসব বিশাল জমায়েতে সামিল হয়েছিলাম। আমরা অনেকেই পার্টি তহবিলে একেবারে মুক্ত হস্তে না হলেও যথেষ্ট ঢেলেছি, আমাদের বাড়ি, পাড়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে ছুটির দিনে এইসব

জমায়েতে মিছিলে যোগ দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে নতুন সমাজ গড়ার ডাকে গলা মিলিয়েছি। গত দু'তিন বছর বলতে গেলে আমাদের শয়নে স্বপনে একই চিন্তা। দু তিন বছর কেন, আরও একটু আগে থেকে, যখন কলকাতার রাস্তায় চালের চড়া দাম নিয়ে পুলিশে জনতায় লড়াই চলল, তখন থেকেই আমাদের যৌবন রাজনীতির সঙ্গে মালাবদল করে নিয়েছিল। আমরা যে সবাই বামপন্থী হয়ে উঠেছি রাতারাতি এমন নয়, কিন্তু ক্রমবর্ধমান হতাশা আর তলিয়ে যাবার বিরুদ্ধে এক সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে এই মেজাজ আমাদের কথাবার্তায় চালচলনে সবসময় প্রকাশ পেত। এই রুখে দাঁড়াবার রাজনীতিতে সোনাই ছিল আমাদের এ অঞ্চলের নেতা।

তারপর ঘটনা দ্রুত মোড় নিতে আরম্ভ করল। যাঁরা সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠে বিপ্লবের গান গেয়েছিলেন তাঁরাই নির্বাচন জিতে সবচেয়ে আগ্ বাড়িয়ে মন্ত্রিত্বের গদি বরণ করলেন এবং এই মন্ত্রিত্ব গ্রহণই যে বিপ্লবের একমাত্র পথ তার জন্য অজস্র লেখা ও বক্তৃতায় সময় ব্যয় করলেন। সোনা থমকে দাঁড়াল। তার মধ্যে একটা চারিত্রিক প্রবণতা বরাবর নজর করেছি, যেটা সে বিশ্বাস করে না তা আঁকড়ে ধরে থাকে না। সেই রাজনৈতিক উত্তাল মুহূর্তে সূর্য ব্যানার্জির অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ানো আমাদের অনেককেই প্রথমে প্রচণ্ড অবাক করে। আমরা অনেক সময় দম দেওয়া পুতুলের মতো চলি, আমাদের রাগ ও অনুরাগের গতিও অনেক ক্ষেত্রে দম দেওয়া পুতুলের মতো। কিন্তু এ গল্পের নায়কের এক অদ্ভুত রোখ্, যেখানেই তার বুদ্ধি ও বিশ্বাস তার জীবনের ও চিন্তার ধারা পাল্টাবার আহ্বান জানিয়েছে, সেখানেই সে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এবং সে নিজেই শুধু পাল্টায় নি, চারপাশের মানুষের ওপর তার প্রভাব ছড়িয়েছে।

একবার আমার মা বলেছিলেন, 'এ বাড়িতে আমার সঙ্গী কেউ নেই, কতগুলো দুশ্চিন্তাই আমার সঙ্গী।' কথায় কথায় মা-র এ মন্তব্য সোনার সামনে করায় সে প্রায় এক সপ্তাহ রোজ সন্ধেবেলা আমার সঙ্গে

কারখানাফেরতা আমাদের বাড়ি আসত। মায়ের এই নিঃসঙ্গতা যে আমাদের সমাজের প্রায় সমস্ত মানুষের জীবনযাত্রার এক রূপক সেটা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করত। 'আমরা সবাই একা হয়ে যাচ্ছি মাসীমা। সবাই এক-একটা আলাদা অস্তিত্ব,' শুধু এক অভ্যাসের জন্যে এক সঙ্গে বাস করি, একসঙ্গে বসি খাই দাই। আসলে কারুর সম্পর্কে আমাদের সামান্য কৌতূহল নেই, আমাদের নিজেদের সম্পর্কেও নেই। আমরা যেন সবাই এক অদৃশ্য নিয়তির হাতে আমাদের কতগুলো ডিভিশান অফ লেবার করে যাচ্ছি। কেউ ফ্যাক্টরীতে কেমিক্যালের প্রেশার টেস্ট করছি, কেউ বা আটার লেচি বানাচ্ছি রান্নাঘরে। কেউ রেডিওতে গান গাইছি, কেউ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে লাখ লাখ লোককে সমাজবাদ সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছি। কিন্তু আসলে মাসীমা আমরা নিজেদের ক্রমাগত ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছি। আমরা কেবল নিজেদের একটা ছোট্ট অস্তিত্ব কোনরকমে সাজিয়েগুজিয়ে রাখতে চাইছি, তারচেয়ে সামান্য কিছু করার মেজাজ আমাদের নেই। আমরা কেউ রাজনৈতিক পার্টির চাকরি করছি, কেউ স্বামীর চাকরি করছি। কিন্তু কখনও ভাবছি না এই ষাট সত্তরটা বছর এমনিভাবে চাকরি করা ছাড়াও আমাদের কিছু করার ছিল। আমরা যে নতুন দর্শনের কথা বলছি তা আমাদের এই নতুন কথা বলছে। তার অজস্র ত্রুটি আছে। আমাদের বিরোধীপক্ষরা লক্ষ লক্ষ কলম ধরেছে এই ত্রুটিগুলো আরও স্পষ্ট করে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। কিন্তু সাম্যবাদের জোর দিনকে দিন বেড়ে চলেছে, একটার পর একটা দেশে তার বিজয়পতাকা উড়ছে। কেন জানেন? এই একটা কারণে—মানুষ তার এই বুকচাপা নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠছে। সে আবার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে জীবনের দিকে। এটাই হল, একালের সবচেয়ে চমৎকার কবিতা।

আমার হয়ত ভুল হতে পারে। হয়ত আমরা মনের মাধুরী দিয়ে এক নিরবয়ব অস্তিত্বকে অবয়ব দান করেছি। হয়ত সাম্যবাদ মানে আসলে অন্যকে ক্রমাগত ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়া, রোজ ভোরবেলায়

উঠে কর্তার পাদোদক খাওয়া, রাত্রে শয়নকালে একশো আটবার নেতার নাম জপ, রিভিশানিস্ট, হঠকারী, সেক্‌টারিয়ান্‌, ইত্যাদি গালভরা শব্দের মাদুলী ধারণ। এমনকি হতেই পারে সাম্যবাদ মানে আসলে কোন এক গোষ্ঠীর অন্তহীন পাওয়ার ষ্ট্রাগল। আমার এই সব সংশয় সন্দেহ প্রশ্ন—এও কিন্তু সোনারই অবদান। সাম্যবাদী জগতের যে সব লোকজনদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে তারা এসব কথায় প্রায় সিঁটিয়ে যান দেখেছি। এ সবই বুর্জোয়া কাগজের দুনিয়া জোড়া অপপ্রচারের মার্কিনী অর্থপুষ্ট প্রোগ্রামের অন্তর্গত এই রকম কথা বাল্যকাল থেকে শুনছি। কিন্তু সোনা আমাকে ইয়েভতুশেঙ্কোর 'জিমা জাংশান' পড়িয়েছিল। আরও এমন এমন সব লেখা পড়িয়েছিল যাতে জীবনের বিপুল বৈচিত্র্যের প্রভাব মোটেই অস্বীকৃত নয়। 'ওরা প্রত্যেকবারই ভুল করে,' সোনা বলত, 'ওরা দেখায় সাম্যবাদ এক অভ্রান্ত অপাপবিদ্ধ ব্যাপার, এমন একটা নিরেট পিতলের প্রতিমা যাকে পুজো করা ছাড়া অথবা বেচে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। আসলে আমাদের প্রত্যেকটা সন্দেহ আমাদের নতুন বিশ্বাস গড়তে সাহায্য করেছে, প্রশ্ন উঠলেই আমরা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। সাম্যবাদ পিতলের প্রতিমা নয়, সাম্যবাদ একটা গাইড টু অ্যাকশান!'

অনেক ঝড়ে জলে ঘূর্ণিবাত্যায় যেমন কোন কোন দালান অক্ষত থাকে আর ঝড় চলে যাবাব পর মরা গরু-মানুষের পচা গন্ধে নাকে কাপড় দিয়ে মাঝে মাঝে ভয়চকিতভাবে লোকে সেই অক্ষত বৃষ্টি ধোয়া রৌদ্রঝলকিত শূন্য বাড়িগুলোর দিকে তাকায়, আমিও এখন তেমনিভাবে সোনার কথাগুলো স্মরণ করি। কিন্তু এত ঝড়ে জলেও সেই কথাগুলোর মহিমা ধুয়ে যায় নি। এক অদৃশ্য সমুদ্রের অন্তহীন স্বরের মতো তা এখনও আমার বুকের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।

সেদিন যখন সোনা ছুটির পর থাকতে বললে, তখন আমার যে একেবারে উদ্বেগ হয় নি তা নয়। সে যে গত দুবছরে ধীরে ধীরে গঙ্গা থেকে রেললাইন অবধি প্রায় এক বর্গ-মাইলব্যাপী কারখানার এলাকায়

রাবার কেমিক্যাল থেকে ক্লোরিন প্ল্যাণ্ট, সেখান থেকে পলিথিন ইউনিট, সেখান থেকে আবার সেনট্রাল ল্যাবরেটরীতে ধীরে ধীরে তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছে তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলবে? সেনট্রাল ল্যাবরেটরীর ইন-চার্জ ডক্টর ভটচাজ তো একেবারে মুগ্ধ। 'আপনার বন্ধু মশাই আশ্চর্য কাজ রপ্ত করেছে। মারভেলাসলি রেসপনসিভ।' কিন্তু রমেনের সঙ্গে কথাবার্তায় তার মানসিক অস্থিরতা স্পষ্ট। এই ট্রেড ইউনিয়ন জগতের সাফল্য যা রমেনের গলা ইতিমধ্যেই আরও মোটা করেছে তা যেন সোনার কাছে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সোনার যা প্রভাব তা যদি সে লগ্নীতে খাটায়, তাহলে রিটায়ারের মুখে প্ল্যাণ্ট ম্যানেজারের কাছাকাছি উঠে যেতে পারে আর যেহেতু আমাদের ইংরেজ কোম্পানীতে বঙ্গসন্তান সম্পর্কে অবিশ্বাস কম, সেহেতু প্ল্যাণ্ট ম্যানেজাররূপে অবসর গ্রহণও অসম্ভব নয়। এরকম ঘটনা আমাদের কারখানায় আগেও যে ঘটেনি এমন নয়। যেমন বিধর্মী অনেক দেবতাকে ফুলচন্দন দিয়ে টেনে নিয়েছে হিন্দুধর্ম নিজের মন্দিরে তেমনি আমাদের কারখানার মালিকরা এই সব তরুণ সক্ষম একরোখা ব্যক্তিত্বকে তাদের প্রতিবাদী বিচ্ছিন্ন ভূমিকা ত্যাগ করে কারখানার সক্রিয় অংশের অংশীদার রূপে পরিবর্তিত হতে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু সোনার ক্ষেত্রে বোধহয় সুরুতেই শেষ।

শিফ্‌ট শেষ হবার ভোঁ বাজতে আমি আমাদের ইউনিট ছেড়ে রাবার কেমিক্যালের দিকে অগ্রসর হই। বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এয়ার কণ্ডিশাণ্ড হল-এ থাকায় টের পাই নি। বৃষ্টি ধোয়া পাকা রাস্তা ধরে এগোই। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে যখন আমি কারখানায় ঢুকি তখনও এ অঞ্চলে ছিল পানের বরোজ আর পুকুর। রাবার কেমিক্যালের ঝকঝকে বিস্তৃত হলুদ দালান, সারি সারি সুদৃশ্য ভেন্টিলেটার, পাশে প্রেণ্ট ইউনিট থেকে রকমারি রঙের গন্ধ, এসবের সঙ্গে সেই কত্ত কত্ত পানের বরোজ, পেঁকো পুকুরের কোন যোগ নেই। বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। পিঠে সোনার হাত পড়ল, 'চলুন, এক জায়গায় যাবেন।'

PUBLIC LIBRARY
55076
4.4.74
AGARTALA

'আমাকে ?'

আমার চোখে বোধহয় চাপা আতঙ্ক ছিল।

সোনা হাসল। হাসলে তার পাতলা মুখখানা আরও ছেলেমানুষ লাগে।

'আপনি যা নয়, তা আপনাকে হতে বলব না', সোনা বললে।

৩

সেদিনের ঘটনার আগে আর একটা ব্যাপার বোধহয় বলা দরকার। কেন মা বলেছিলেন, 'এ বাড়িতে আমার সঙ্গী কেউ নেই, কতগুলো দুশ্চিন্তাই কেবল আমার সঙ্গী।'

বোধহয় মাস দুতিন আগের ব্যাপার। কারখানা থেকে ফিরেই বাবার গলার আওয়াজ পেলাম, 'তোমরা আমাকে কী পেয়েছো? কী চাও আমার কাছে? আমি একটা লোক সারাজীবন চেষ্টা করেছি সংসার করতে। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রাম ছাড়া অফিস যাই নি, টিফিনে শুকনো পাঁউরুটি চিবিয়েছি। আর তুমি সারাজীবন বাগড়া দিয়ে এসেছো।··· তুমি কী হতে চাও, কী হতে চেয়েছিলে, বিশ বছর আগে তোমাকে লোকে কী বলতো, তোমার কোন্ গল্প কোন্ বোগাস কাগজে বেরিয়েছিল এসব তো আমার জানবার কথা নয়। তুমি সুন্দরী ছিলে, এখন ধুমসী হয়েছো, তাতে আমি কি করব বাপু! আমি তো ডাক্তারের খরচায় কোন কার্পণ্য করি নি। আসলে তুমি একটা মানসিক ব্যাধিতে ভুগছো অমলা। তোমার পেটের উইণ্ডের চিকিৎসাটা ছাড়ো। তোমার মাথার উইণ্ডের চিকিৎসাটা করাও।'

'আমি ঠিক জানি তুমি এই রকম বলবে। তোমাকে ঠিক জন্তুর মতো লাগছে', মায়ের সুরেলা গলা পাশের ঘর থেকে।

'সেটা অ্যাদ্দিনে বুঝলে? আমি জন্তু, আর তুমি? তুমি নটী?' বাবা তাঁর টাক মাথা আর মোটা শরীরখানা নিয়ে বিকট নাচের ভঙ্গী করেন।

মায়ের খুব ঠাণ্ডা মিহি গলার আওয়াজ আসে। তাঁর মানে তিনি অভিভূত। পাশের ঘর থেকে উঠে আসব কিনা ভাবি। বাবা ঠিকই বলেছেন, অসুখটা মানসিক। উত্তেজনা হলেই ডান হাতে একটা ব্যথা চিন্-চিন্ করতে করতে গোটা হাতখানাকেই অবশ করে দেয়। এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থা চলে মাস দুতিনেক।

মা তাঁর নৃত্যরত স্বামীর দিকে চেয়ে চেয়ে বলেন, 'লজ্জা করে না? বাজারের মেয়ে নিয়ে থাকো। আবার নটি-নটি করে চেঁচাচ্ছো।'

বাবার মুখখানা দেখতে খারাপ নয়, কিন্তু রাগে নাক ফুলে গেলেই কদাকার দেখায়। মোটা নাকের ওপর চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।

এগিয়ে এসে বলেন, 'ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়। গোবিন্দ মিত্তির বাজারের মেয়ে নিয়ে থাকে, এতো জলের মতো সহজ কথা। তবে বাজারের মেয়েরা অন্তত তোমার থেকে ভাল। তারা অন্তত এনটারটেন করতে পারে। আর তুমি? তুমি তো একটা খোদার খাসী!'

মা হঠাৎ চোখ বন্ধ করলেন। ধীরে ধীরে একবার ডান হাতখানা তুলবার চেষ্টা করলেন। আমি আধভেজানো দরজার পাশে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম।

'গ্যাখ দেখি, কি বিচ্ছিরি কাণ্ড! যত আশীকালের বাসি কথা।'

কোন জবাব না দিয়ে আমি মাকে জড়িয়ে ধরে তক্তাপোষের ওপর শুইয়ে দিই। আস্তে ডান হাতখানা টিপে দিতে থাকি। তারপর দক্ষিণ কলকাতার এক ফিজিওথেরাপী ক্লিনিকের মেল-নার্স স্থানীয় অধিবাসী সুনীল দাস যেরকম শিখিয়ে দিয়েছিল, তেমনিভাবে তাঁর হাতখানা কাঁধের ওপর দিয়ে একবার ওপর আর একবার নীচে করতে থাকি।

'তোদের কোম্পানীর গণ্ডগোল মিটে গেছে?'

জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করি না।

'অবশ্য তোদের আর কী করণীয়? স্ট্রাইকের পক্ষে হাত তুলতে বললে হাত তুলবি। বাংলাদেশটা এই করে গেল! যত ভেড়ার পাল!'

আমি এবার হাতখানা নিয়ে সাইডওয়াইজ মুভমেণ্ট করাতে থাকি। এটাও সুনীল আমাকে শিখিয়েছিল। 'ঘাড় ঘেঁষে হাতখানা ক্লক ওয়াইজ ঘুরাতে থাকবেন', ফর্সা বেঁটে ছোকরাটির নির্দেশ মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। মা নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকেন।

'আসলে আমি একটু বেশী চটে গিয়েছিলাম,' বাবা আমার চোখের দিকে সোজা তাকাবার চেষ্টা করে চোখ নামিয়ে বললেন।

'আসলে তোর মা জানিস, বরাবর বড্ড ভিজে। তোদের এখন বয়স হয়েছে। তুদিন পর বিয়ে-থা করবি, সংসার করবি। ভিজে মেয়েমানুষ কখনো বিয়ে করবি না। যা বলছিস সব করছে। কোন ব্যাপারে রাশ টানছে না। দেখবি লাইফ হেল হয়ে যাবে।'

দশ বছর আগে যখন বাবার কেলেঙ্কারী জানাজানি হয়ে পড়ে, তখন আমি পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বাবার ওপর। বাবা হাই ব্লাড-প্রেশারের লোক, একবার কলকাতায় ট্রাম লাইনেও মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গায়ে তখনও তাঁর অসাধারণ শক্তি। ছেলেবেলায় স্বপ্নের মতো মনে আছে ঘুসি মেরে ডাব ফাটাতেন। বাবা এক ঝটকায় তাঁর গা থেকে আমাকে ঝেড়ে ফেললেন। আমি আছড়ে পড়েছিলাম দরজার কানায়। লোহার কড়ায় চোট লেগে মাথা ফাটল। সে অবস্থায় আমি প্রাণপণে বাবার কড়ে আঙ্গুল কামড়ে ধরলাম। একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। তারপর থেকেই বাবা গঙ্গার গায়ে তাঁর প্লাইউডের কারখানায় একটা আউট হাউসে গিয়ে উঠলেন।

বাবা তাই মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি এলেই আমি একটু সিঁটিয়ে যাই। আগে যেমন এক প্রচণ্ড হিংস্র বিজাতীয় ভাব পোষণ করতাম মনে মনে, এখন তা অনেক কমে গিয়েছে। বাবার যৌবনের উদ্দামতা এখন অনেক পরিমাণ স্তিমিত। আমাদের বাড়ির এক চিলতে উঠোনে আমার একটু বাগান করার বাই ছিল। যেদিন কারখানা থেকে একটু সকাল সকাল ফিরতাম সেদিন খুরপি নিয়ে কয়েকটা টব খোঁচাখুঁচি করতাম। একদিন দেখি বিকেলবেলা ঝাঁকামুটের মাথায় কয়েকটা লিলি ফুল শুদ্ধ টব আর নিজের হাতেও তুটো ঝুলিয়ে হাঁসফাস করতে করতে আসছেন। বছর তুতিন হল মায়ের জন্যে পূজোর সময় একশো বিশ কাউণ্টের বাংলা তাঁতের মিহি শাড়িও আনছেন। মা অবশ্য সেগুলো ছোন নি।

মায়ের হাতের সাইডওয়াইজ মুভমেণ্ট করতে করতে একটা পুরনো চিন্তা ফিরে আসে। মা এখন মোটা হয়ে গেলেও যথেষ্ট সুন্দরী। বিশেষ

করে তাঁর ভাষাময় চোখ দুটি আমার এত বছরের সঙ্গী হলেও তাদের আকর্ষণ এখনও আমার কাছে অটুট। আগে যেরকম ভাবতাম, শুধু মেয়েবাজির জন্যেই বাবার সঙ্গে মা-র মিল হয় নি, একথাটা বোধহয় ঠিক নয়। আরও কোন এক দুর্নিরীক্ষ্য অলঙ্ঘনীয় দেয়াল ছিল, দুই মেজাজের বৈপরীত্যে যার ফলে এ দুজনের একসঙ্গে বাস অকল্পনীয়।

বাবা একটা সিগারেট বার করে ধরালেন। আগে ধূমপান করতেন না, একমাত্র মহিলা সম্পর্কে উৎসাহ ছাড়া তাঁর কোন ব্যাপারে নেশা ছিল না, সম্প্রতি সিগারেট ধরেছেন।

'তোকে বলি নি গত হপ্তায় মামলা জিতেছি?'

আমি মায়ের হাতখানা আলগোছে বিছানায় রেখে বাবার দিকে চেয়ে থাকি।

'অবিনাশ চ্যাটার্জি আমায় বললে, অবিনাশ চ্যাটার্জি, জানিস তো, বারের নাম্বার টু। এক্‌ডালিয়া প্লেসে বাড়ি। আমি সোজা বাড়ি গিয়ে হাজির। আমার কেস সাজানো দেখে ভদ্রলোক অবাক। বললে কি জানিস, আপনাদের মতো লোকজন বেশী থাকলে তো আমাদের ব্যবসা তুলে দিতে হবে।'

বাবার জীবনে দুটি মাত্র গ্র্যাণ্ড প্যাশান—মামলা ও মেয়েমানুষ। দ্বিতীয়টির আকর্ষণ এখন স্তিমিত কিন্তু প্রথমটির অদম্য আকর্ষণেই চলছেন। বলতে কি, মামলাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। উনি স্পেকুলেট করে মামলা ঠুকে দেন। কোনটা জেতা মামলা কোনটা হারা মামলা তা তাঁর নখদর্পণে। মাড়োয়ারী এক ফার্ম তাঁকে ঠকিয়েছিল। দশ বছর মামলা চালিয়ে খরচ শুদ্ধ তুলে নিয়েছেন।

বাবার মাথা ছোট, গা বড়। মোটা ঠোঁটের ওপর একজোড়া ছুঁচলো পাকা গোঁফ। চোখ দুটো ঠিক মায়ের বিপরীত, তীক্ষ্ণ, সবসময় যেন কোন মজায় উদ্ভাসিত। এতক্ষণ মা-র সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন, তখন ঠোঁট দুটো নাটকীয় ভাবে বেঁকিয়ে দিয়েছিলেন, নাক ফুলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন যেন নিজের জগতে ফিরে এসেছেন।

'তোকে বললাম কারখানা দেখতে, আর তুই কিনা সাহেবদের কারখানায় মজুর ঠেঙাচ্ছিস ? কত টাকা তোকে দিতে পারে ? পাঁচশো, সাতশো, হাজার ? তার বেশী তো নয়। কোথায় তুই তোর ড্রাইভ, তোর ইনিশিয়েটিভ দেখাবি ?···আমাদের গভর্ণমেন্টের এখন হাজার রকম প্রোজেক্ট। কতরকম ভাবে টাকা রোজগারের ফিকির হয়েছে আজকাল, তোরা ভাবতে পারবি না। এইসব জিনিষগুলো অবাঙালীরা লুটে পুটে খেয়ে নিচ্ছে। আর তোরা ভোর ছটায় ট্রেন ধরে কারখানায় দৌড়োচ্ছিস, আর ছিবড়ে হয়ে ফিরছিস সন্ধেবেলা। জীবনের বেস্ট পিরিয়ড ওয়েস্ট করে ফেলছিস।'

'আঃ!' বলে মা একবার অস্ফুট আওয়াজ করলেন। আমি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে হাত আর কাঁধ টিপে দিতে থাকি।

'আমার তুনম্বর ফ্যাক্টরীটা তো প্রায় উঠেই গিয়েছিল। প্রায় লাখ টাকার মেসিন, আমার জীবনের অ্যামবিশান, ধুলো পড়ে, মর্চে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আমি ছাড়ি নি।'

এ কাহিনী আমি বেশ কয়েকবার শুনেছি। সেই সুয়েজ অবরোধে তাঁর কারখানার মেশিনারী আটক পড়েছিল আফ্রিকায়। বছর খানেক আটক থাকার পর যখন মাল খালাস করলেন কলকাতা বন্দরে তখন তাঁর তিন লাখ টাকার সরকারী অর্ডার হাত বদল হয়ে চলে গেছে জনৈক পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর হাতে। তারপর জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে মামলা। গত বছর মামলা জিতে উনচল্লিশ হাজার টাকা পেয়েছেন। একটা বাস কিনেছেন। বসিরহাট এলাকায় চালাবার পারমিট পেয়েছেন সম্প্রতি।

আমি হাই তুলে বলি, 'আপনি এলেই অশান্তি। আপনি এলেই মায়ের শরীর খারাপ হয়।'

কথাটা কানে না নিয়ে বাবা বললেন, 'আমার ওপর গুপ্তি চালিয়েছিল জানিস না ? আমি ঝপ করে হাতখানা ধরেই এক হ্যাঁচকায় কেড়ে নিয়ে বললাম, এবার আমার পালা। লোকটা আমার পায়ে পড়ল। তুলসী বোসের চেলা, উল্টোডাঙ্গার নামকরা ওয়াগনব্রেকার। তার সাকরেদ।

এখন আমায় বলছে, আপনার যা দরকার হবে স্যার, বলবেন। একবার হাঁ করবেন তাহলেই হবে।'

বাবা সত্যিই কীর্তিমান পুরুষ। জীবনে অনেক লড়াই করেছেন। এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারেন নি। নতুন নতুন উদ্যোগে নিজেকে ঠেলে দিয়েছেন। খালি এক জায়গায় তিনি হেরেছেন। তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর একমাত্র ছেলের কাছে। তিনি জানেন যে, এখানে তিনি কোন শ্রদ্ধার দাবী রাখতে পারেন না। আর বোধহয় তা জেনেই মরিয়া হয়ে তিনি তার কারখানা বিস্তার কাহিনী, মামলাযুদ্ধে তাঁর পরাক্রমের কীর্তি আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র উজাড় করে ঢেলে দেন। আমি তাঁর জগত যে বুঝি না শুধু তা নয়, সে জগত সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই একথাও তাঁকে আমার ব্যবহারে বারবার জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় কোন কার্পণ্য করি নি। কিন্তু তাতে বাবার উৎসাহের আগুনে বোধহয় আমি ঘি ছিটিয়েছি।

'আপনি আজকাল ওয়াগনব্রেকারদের হাত করছেন?' ইচ্ছে করেই বললাম তাঁর উৎসাহ নেভানোর জন্যে।

শূন্যে তাঁর মোটা থাবাখানা তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই তো সব তোদের ভুল ধারণা। তোর, তোর মায়ের।' ওয়াগনব্রেকার, বাজারের মেয়ে এরা মানুষ না? মানুষ খালি পলিথিন কারখানার অ্যাসিস্টেণ্ট আর বেণু বোসের বোন?'

বড় মামার নাম করার মধ্যে মায়ের সঙ্গে আবার নতুন করে ঝগড়া বাধাবার তাল ঠুকছেন, বুঝতে পারি। বড়মামা বায়োলজির ওপর টেক্সট বই লিখে চারতলা বাড়ি তুলে দেহরক্ষা করেছেন। তিনটে ছেলে —পলাশ, পবিত্র আর সুশীতল, তিনটেই দামড়া। এক পয়সা রোজগার নেই। পলাশ স্থানীয় গুণ্ডা। ভাড়ার টাকায় আর বছরে দুটো উৎসব—কালীপূজো আর নেতাজী উৎসবে ছোটখাটো ব্যবসায়ী আর দোকানদারদের ওপর হামলা করে যে চাঁদা ওঠে তাতেই তার সংসার চলে।

বাবা শুধু বড়মামাতেই থামলেন না। বললেন, 'তোর পলাশদা, সুশীতলদা, পবিত্রদা—এরাই মানুষ—না?'

'আমাকে কেন বলছেন এসব কথা? আমি ওদের সঙ্গে মিশি?'

'না না, তুই মিশিস না, তোর মধ্যে পদার্থ ছিল। আমি তো বরাবর বলি। এই মা-র পেছনে তোর জীবনটা নষ্ট করলি।'

'তার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

বাবা চুপ করে যান। বোধহয় আমার আঙুল কামড়ানোর নাটক তাঁর স্মরণে খেলে যায়। বরাবরই লক্ষ করেছি, ধমক দিলেই তিনি থেমে যান। তখন আমার একটু কষ্টও হয়। বাবার মধ্যে যে প্রকাণ্ড প্রাণপ্রাচুর্য তা আমার নেই, সেজন্যে বোধহয় তলে তলে তাঁর সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে আমার এক ধরনের আকর্ষণও জন্মাচ্ছে।

'রাত হয়ে যাচ্ছে, চলি।' বাবা উঠে দাঁড়ালেন।

'চা আনাচ্ছি, বসুন।' আমি হুকুম করি। বাবা আবার থপ করে বসে পড়েন।

রাস্তার উল্টোদিকে কার্তিক ক্যাবিন-এর ছোকরা দু পেয়ালা চা দিয়ে যাবার পর যে অবস্থা হল তা অসহনীয়। মা মড়ার মতো পড়ে থাকেন। আমরা দুজনে নিঃশব্দে চা পান করি। গরম পানীয় ঠোঁটে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা কেমন আত্মসচেতন হয়ে পড়েন। এমন ক্ষেত্রে মহিলারা যেরকম করে থাকেন অর্থাৎ উত্তেজনার জলপ্রপাত নামিয়ে দেন, মায়ের ক্ষেত্রে একেবারে তার উল্টো ঘটনা ঘটে। বাবার সঙ্গে কথার পাঞ্জা কষাকষিতে বরাবরই মায়ের নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া লক্ষণীয়। বাবা একা তাঁর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় লাফিয়ে দাপিয়ে মুখের ফেনা তুলে ফেলেন। আর বাবা যতো চেঁচান মা ততো এক নৈঃশব্দের মোড়কে নিজেকে পাকিয়ে পাকিয়ে মোড়েন। বাবার কোন কথাই তাঁকে স্পর্শ করে না।

'তুই একটু আইন পড়লে পারিস', বাবা চায়ের পেয়ালা সরিয়ে রেখে বললেন। তারপর আমার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন,

'আমি ওকালতির কথা বলছি না। আমি বলছি জ্ঞানের কথা। আইনের বইতে যা পাওয়া যায়।'

'কী পাওয়া যায়?' বাবার এই নতুন জ্ঞানদানের প্রচেষ্টায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বলি।

'আইনের বই আমার কাছে অনেক আছে। মায়ের সেবা করে সময় নষ্ট না করে ওগুলো একটু নাড়াচাড়া করতে পারিস।'

'তাতে কী হাতি ঘোড়া আছে? কতগুলো খুনী, তারা কেমনভাবে খুন করেছে কিংবা করে নি, এই তো?'

বাবা তক্তাপোষের ওপর জাঁকিয়ে বসেন। ধুতির ওপর লম্বা ঘিয়ে-রঙের পুরো হাতা টেরিলিনের শার্ট ঠেলে ভুঁড়ির প্রকাণ্ড উপস্থিতি এখন খুব স্পষ্ট।

'আচ্ছা, মানুষ সাধু কেন হয় বলতো?'

বাবা চিরকালই কথায় খুব ওস্তাদ। একবার দিদির ওপর অসহ্য অন্যায়ের প্রতিবাদে বাবার নাক ফাটিয়ে দেবার জন্যে গিয়েছিলেন ছোট-মামা। ফিরে এলেন একপেট রাজভোগ খেয়ে এবং বাবার কারখানায় এক ছোটখাটো বদলি চাকরি নিয়ে। বিশেষ করে বাবা যখন তাঁর জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করেন তখন আমি ও মা বাদ দিয়ে অনেকেই আকৃষ্ট হন বলে শুনেছি। ইতিমধ্যেই আমি ক্লান্তি বোধ করছিলাম। বারান্দায় উঠে গিয়ে কয়েক মগ জল মুখে ঘাড়ে ঝাপটা দিলাম। অফিসের ঘেমো লেপ্টে থাকা প্যাণ্ট ছেড়ে গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে এসে বসলাম। মার পায়ের কাছে টেবিল ফ্যানে বসে ক্লান্তিটা কাটছে মনে হল।

'সাধু মানুষ হয় তার কারণ না হয়ে পারে না বলে। ক্রিমিনাল মানুষ হয়, না হয়ে পারে না বলে।'

বাবার এই ধরনের কথা-বার্তায় যে আত্মপক্ষ সমর্থনের ঝোঁক ছিল তাতে আমি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠি। একবার মায়ের দিকে তাকাই। মা তাঁর বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

'কষ্ট হচ্ছে?' আমি জিজ্ঞাসা করি। মা মাথা নাড়েন।

'আজকাল একটা লোকের খুব নাম শোনা যাচ্ছে—খোরানা না কি একটা উদ্ভট নাম। লোকটার সম্পর্কে একটা আমেরিকান কাগজে পড়ছিলাম।'

আমি ভীষণ সিঁটিয়ে যাই এইসব বিখ্যাত কাগজ ম্যাগাজিনের প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে সূর্য ব্যানার্জির কথাবার্তা কোন দাগ ফেলে নি আমার ওপর। কারণ সূর্য ম্যাস্‌মিডিয়ার শক্তি সম্পর্কে সচেতন থেকে পার্টির সমর্থনে তাদের ওপর চাপ দেওয়ার কথাও মাঝে মাঝে বলত। কিন্তু আমার কাছে ও ব্যাপারটা একেবারে অগ্রাহ্য। বড় বড় ম্যাগাজিন খবরের কাগজ এক-একটা বড় বড় ব্যবসা। ষ্টিল সিমেণ্ট পাটকলের মতো জনতার মনোরঞ্জনের এই সব কলগুলো সম্পর্কে আমার কোন কালেই কোন আগ্রহ নেই। বরং দৈনন্দিন ট্রেনে আমি ভূতের গল্প পড়তে ভালবাসি। যখন দুটোই আদতে ভৌতিক, অবাস্তব, তখন দুটোর মধ্যে সত্যিকারের ভূতদের কাহিনী আমি বেছে নিয়েছিলাম।

বাবা বোধহয় আমার মুখে প্রতিবাদের চেহারা দেখে সজাগ হয়ে উঠলেন—'এটা কোন হেঁজিপেঁজি ব্যাপার নয়। নোবেল-প্রাইজ পাওয়া লোকের কথা। আসলে মানুষ সাধু হয়, ক্রিমিনাল হয় তার জিন্‌-এর জন্যে। জিন্ যেদিন আমরা কন্‌ট্রোল করতে পারব সেদিন আর আমাদের কোন সমস্যা থাকবে না। এই সব ইনক্লাব জিন্দাবাদের কোন দরকার হবে না। জিন্ কন্‌ট্রোল করতে পারলে মানুষ আর ক্রিমিনাল থাকবে না। সবাই সৎ হয়ে পড়বে।' বাবার মোটাসোটা চকচকে স্বাস্থ্যবান মুখে, তাঁর পাকা ছুঁচলো গোঁফে বিদ্রূপের হাসি খেলে। যেন তিনি যা বলছেন তা মোটেই বিশ্বাস করেন না।

বাবার এই তুখোড় চিন্তাশীল রূপ শুনেছি সরকারী পারমিট আদায়ে খুব কার্যকরী হয়। বিশেষ করে কিছু কিছু তরুণ অফিসার আছেন যাঁরা চাকরী করবার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্টেলেকচ্যুয়াল আলাপে পক্ষপাতী। বাবার মতো একজন ইণ্টেলিজেণ্ট শিক্ষিত লোক ব্যবসায় নেমেছেন এটা তাঁর পারমিট লাভের স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

'আপনাকে দেখে আমার কী মনে হয় জানেন? ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড।'

বাংলায় অনূদিত বইখানা ছেলেবেলায় আমার এক জন্মদিনে বাবাই উপহার দিয়েছিলেন।

বাবার নাক হঠাৎ মোটা হয়ে যায়। 'কাওয়ার্ড, ইম্‌বেসিল!' রাগলে ইংরেজীতে গালাগাল দিতে ভালবাসেন।

তাঁর এ রাগ আমাকে স্পর্শ করে না। যদি তাঁর সম্পর্কে আমার কোন বোধ থাকত তাহলে নিশ্চয় তাঁর গালাগালে আমি অভিভূত হতাম, ক্রুদ্ধ হতাম। কিন্তু বাবা আমার জীবনে আগন্তুক মাত্র, এবং বেয়াড়া আগন্তুক। ধীরে ধীরে বললাম, 'কাওয়ার্ড বলছেন কেন? আপনার ফ্যাক্টরিতে ঢুকছি না বলে। আমাদের কারখানা আপনার কারখানার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ভাল মাইনে দেয়, অনেক মডার্ণ।'

'চাকর! চাকর!' বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আপনার চাকর হওয়ার চেয়ে আমাদের কারখানার চাকর হওয়া অনেক ভাল।'

মা আবার 'আঃ' বলে আওয়াজ করেন। সেদিকে তাকাতেই বাবা হেসে ফেলেন।

'তোর মধ্যে পদার্থ ছিল রে, গোমু! আমার তেজ আছে তোর মধ্যে। সেইজন্যেই তো কষ্ট হয়।'

এটা যে পরিপূর্ণ থিয়েটার তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আমি চটে যাওয়ায় বাবা তাঁর 'জ্ঞান' দান থেকে বিরত হয়ে আবার নতুনভাবে আমাকে ভজাবার চেষ্টা করছেন। এবার আমার হঠাৎ সূর্যের কথা খেলে যায় মনের মধ্যে। সূর্য আমাকে প্যাভলভের কথা বলেছিল।

'কেউ বলে জিন্‌-এর প্রভাব, কেউ বলে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব— এগুলো আমরা কেউই বিশেষ কিছু জানি না। কেমন বলুন?'

বাবা আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকান। সে চাহনিতে প্রশংসা স্পষ্ট।

'কেউ বলছে পরিবেশ পাল্‌টে একটা লোককেই ফুটবল খেলোয়াড়

বিজ্ঞানী সাহিত্যিক বানিয়ে দেওয়া যায়। আবার আপনার ম্যাগাজিন বলছে, জিন্ পাল্টে মানুষকে ওলোট পালট করে দেবে। কিন্তু এসব আলোচনায় কোন ফয়দা আছে? যারা রিসার্চ করে ল্যাবরেটরীতে বসে, হাজার হাজার টাকা মাইনে পায়, তারা এইসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাক। আর আমরা, এই ঢুনিয়ার আবর্জনাগুলো ততক্ষণে একটু সাফ করি, মানুষ যাতে একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারে।'

সোনার একটা গোটা কোটেশান বাবাকে শুনিয়ে দিলাম। ঠিক কোন প্রসঙ্গে বলেছিল খেয়াল নেই, বোধহয় তার কোন প্রিয় লেখকের লেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিল। বাবা কিন্তু মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'লাইফটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেললি তুই। তোর মধ্যে অনেক সম্ভাবনা ছিল।'

আমার কী হল সেদিন জানি না। হঠাৎ বলে ফেললাম, 'এগুলো একটাও আমার নিজের কথা নয়। আমার এক বন্ধুর কথা যাকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি।'

বাবার মুগ্ধ দৃষ্টি কেটে যায়। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর মোটা তর্জনী চোখের সামনে উঁচিয়ে বলেন, 'সূর্য ব্যানার্জি?'

'তুমি কি করে জানলে?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

'বি কেয়ারফুল। হি ইজ ডেনজারাস। পুলিসের খাতায় নাম আছে।'

'আপনি কি আই-বিতেও ঢুকেছেন নাকি? তাহলে আর এ বাড়িতে ঢুকবেন না।' চাপা রাগ গলার কাছে ঠেলে ওঠে আমার।

'বাজে কথা বলিস না গোমু। ব্যবসা করতে গেলেই পুলিশের সঙ্গে খাতির রাখতে হয়। আমরা প্র্যাক্টিকাল লোক। মাটিতে পা রেখে চলি। বাংলাদেশের ইয়াংম্যান্দের কী অসুবিধে জানিস? তারা মাটিতে পা রেখে চলা ভুলে গেছে। আসলে কাদের দরকার জানিস? প্র্যাক্টিকাল আর্থি পিপল্। বিপ্লব-বিপ্লব বলে চেঁচাচ্ছে, স্লোগান দিচ্ছে, পোষ্টার মারছে—এদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। এরা আসলে বোকা, হুজুগে। হুজুগ তো অনেক হল। এখন কাজে মন দে।'

দূরে থানা থেকে পেটা ঘণ্টার আওয়াজ আসে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ভোঁ দেয়। আমি হাই তুলে বলি, 'অনেক বাজল।'

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'বি কেয়ার-ফুল অ্যাবাউট সূর্য ব্যানার্জি। শেষে বিপদে পড়বি।'

'আপনার জ্ঞান বাদ দিয়েই তো একরকম জীবনটা কাটছে। বাকি জীবনটাও তেমনি কাটবে। কি বলুন?'

'তা ঠিক, তা ঠিক', পরাজিত নায়কের মতো বাবা অন্ধকারে প্রস্থান করেন।

৪

বাবা চলে যাবার পরও মা শুয়ে থাকেন চোখ বন্ধ করে।

'ভাত বাড়ব?'

মা কোন জবাব দেন না। এতক্ষণে ক্ষিধেটা বেশ মালুম হচ্ছিল। কারখানা থেকে ফিরেই আমি ভাত খেয়ে নিই। বাবার আর্বিভাবে সে নিয়মের ব্যতিক্রম বোধহয় খালি পেটে চা পড়ায় বুঝতে পারি নি। এখন ক্ষিধের চোটে পেট ব্যথা শুরু হয়।

ঠিক এই সময় মা বলে ওঠেন কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে, 'আমার এ বাড়িতে কেউ সঙ্গী নেই, কেবল কতগুলো দুশ্চিন্তাই আমার সঙ্গী।'

এ কথায় আমার রাগ হল। বাবার কথাগুলো বোধহয় আমাকে প্রভাবিত করেছিল। কারখানা বাদ দিয়ে একটাই আমার কাজ— মায়ের নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হওয়া। আমি জানি তাতে মা-র মন ভরে না। কিন্তু আমার এই চেষ্টার মধ্যে বড় রকম ফাঁক ছিল না। মা একথাটা বুঝলেন না বলে চটে গেলাম। চাপা রাগে দ্বিতীয়বার বললাম, 'ভাত বাড়ব?'

'আমি খাব না, তুই খেয়ে নে।'

আমি জানতাম, না খেলে মায়ের শরীর আরও খারাপ হবে। রাতে ঘুম হবে না। একদিন ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি জানলায় চাঁদের আলোয় বসে মা জন্তুর মতো চেঁচিয়ে কাঁদছেন। কিন্তু মাকে অনুরোধ করায় কোন ফল হবে না জানতাম। পাশের ঘরে গিয়ে জনতা স্টোভ ধরিয়ে খাবার গরম করতে বসি। ছুটো ধেড়ে ইঁদুর হঠাৎ ভাঁড়ারের তাক থেকে নেমে আমার গায়ের কাছে চলে আসে। আমি আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলাম এবং আমার পায়ের ধাক্কায় ডালের হাঁড়িটা উল্টে গেল। আমার হঠাৎ এত বয়সেও কান্না পেয়ে যায়। প্রকাণ্ড ব্যর্থতায় ক্ষোভে আমার চোখ ফেটে জল আসে। আঁচড়ে আঁচড়ে শুকনো থকথকে কলাইয়ের ডালগুলো তুলে ভাতের সঙ্গে চটকে গপ-গপ করে খেতে থাকি। খাবার

পর আমাদের বাড়ির পাশের গ্যারাজে কান্তিবাবুর গাড়ি ঢোকাবার আওয়াজ আসে। আমি সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করি।

উঠে গিয়ে টেবিলের টানা খুলে হাতঘড়ি দেখি। এখনও সাড়ে আটটা বাজতে সাত মিনিট বাকি। প্রত্যেক সন্ধের মতো এক প্রকাণ্ড অস্থিরতায় ছটফট করি। এক-একবার ভাবি হয়তো ঘড়িটা ঠিক চলছে না অথবা কান্তিবাবুর ফেরবার সময় এদিক ওদিক হয়েছে। কিন্তু কান্তিবাবুর গ্যারাজে গাড়ি তোলার সঙ্গে ঘড়ি মেলানো যায়। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে সন্ধেবেলা বাজারে বাংলা খেয়ে আটটা বেজে পনেরো মিনিটে গাড়ি তোলেন। কোন নড়চড় নেই।

ঠিক এ সময়টা আমি সূর্য ব্যানার্জির কথাও ভাবতাম না। এই সময়টা আমি এমন এক নিবিড় মাদকতায় আচ্ছন্ন থাকতাম যে, সমস্ত পৃথিবী আমার চোখের সামনে থেকে সরে যেত। থাকত কেবল একটাই জিনিষ—আমার শরীর। এমনকি আর একটা শরীরের আগমনের জন্যে আমি যে উদগ্রীব হয়ে থাকতাম সেটাও যেন আমারই শরীরের এক বর্ধিত অংশ। খাওয়া বাদ দিয়ে যেমন খাদ্যের কোন অর্থ নেই, সেই আগন্তুক শরীরেরও কোন অর্থ নেই আমার শরীরের এই উত্তেজনা ছাড়া। আমার রক্ত চনমন-করা এ অপেক্ষা বাদ দিয়ে কান্তিবাবুর মেয়ে বিনতার কোন অস্তিত্ব নেই।

বিনতার একটুও দেরী হয়নি। আমার হাতঘড়িতে ঠিক সাড়ে আটটা বাজতে না-বাজতেই আমার ভেজানো দরজা অল্প অল্প করে খুলে যায়। ঘর অন্ধকার। বিনতা কাছে আসতেই আমি তাকে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিই। এক ঝলক রান্নার মশলার গন্ধ, স্নো ঘামের গন্ধে আমি অভিভূত হয়ে থাকি।

আমাদের হাতে বোধহয় পনেরোটা কি কুড়িটা মিনিট। তাই কথা বলে সময়টা নষ্ট করি না। আর সত্যিই, কী কথা বলার আছে? 'তোমাকে না হলে আমার চলবে না, তুমি কি সুন্দর!'—এসবগুলো আমরা যে বলিনি, তা নয়। কারণ বিনতাও একটা ছুটো রবীন্দ্র-

সঙ্গীতের এক আধখানা অংশ জানত না এমন নয়। কিন্তু এগুলো আমাদের দুজনের কাছে কেমন ফেকলু লাগত। তার থেকে বিনতার ঘাড়, চোখ, পিঠ, বুক-এর যে এক প্রত্যক্ষ বাস্তব উপস্থিতি, তা আমার কারখানার যন্ত্রপাতির বাস্তবতার মতো আমার সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখত। তার শরীর থেকে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল তার চোখ দুটো—তার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল জান্তব চোখদুটো আমি বড্ড ভালবাসতাম। সে চোখ দুটোও সেদিন বিষণ্ণ লাগছিল।

'তুমি গোনুদা, আমায় বিয়ে করবে না, জানি।'

'মুখ বন্ধ, মুখ বন্ধ', আমি তার ঠোঁট দুটো আঙুল দিয়ে চেপে ধরি।

বিনতা মাথা ঝাঁকিয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'আমি জানি।'

'তুমি জানো না, তোমাকে কেউ জানিয়েছে। বলো, আমি ঠিক বলিনি ?'

বিনতার চোখ অন্ধকারে চকচক করে, 'কথাটা কি মিথ্যে ?'

'মিথ্যে মিথ্যে !' আমি আবার সেই গন্ধ আর উষ্ণতায় ভরা উপস্থিতিকে আমার সমস্ত শরীরের সঙ্গে লেপ্টে ধরি।

'গোনু গোনু, আমার কী হল ! ওঃ !' মা পাশের ঘর থেকে বিকট আওয়াজ করেন।

আমার নিজের শরীরখানা থেকে মনটা হ্যাঁচকা মেরে বার করে আনি। পাশের ঘরে মা যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। আমি আমার ঘরে ঢুকে লুঙ্গি ছেড়ে আবার কোঁচকানো প্যান্ট পরে ফেলি। বিনতা তাড়াতাড়ি আমার চিরুনী দিয়ে তার অবিন্যস্ত চুলগুলো সামলে বেরিয়ে যায়। ভাত ফুটে এসেছে, তাকে গিয়ে এখনি নামাতে হবে।

ডাক্তারকে পেলাম না। বাড়ির বারান্দাখানায় পাঁচ টাকা ভাড়ায় যে আলুওয়ালা বসে তার কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্ন আছে, ফিরতে রাত হবে। বাজারের কাছে উদভ্রান্তভাবে ঘুরছি। মুদির দোকানে ট্র্যানজিস্টরে 'তুমি যে কী দিয়েছিলে তা তো তুমি

জানো না' গান শুনতে শুনতে ক্লান্তিতে হাই তুলছি এমন সময় হঠাৎ সোনার আর্বিভাব।

'আপনি ? এখন ?'

আমার আগমনের কারণ আধখানা বলা হতে না হতেই আমাকে টেনে নিয়ে একটা সাইকেল রিক্সায় চাপিয়ে সোনা চলল তার এক বন্ধু ও ভক্ত ডাক্তারের বাড়ি। সে ছোকরাও বাড়ি নেই। আরও এক মাইল এগিয়ে একেবারে গঙ্গার গায়ে এক আড্ডা থেকে তাকে সাইকেল রিক্সায় তুলে আমরা রাত এগারোটায় ফিরলাম। ইনজেকশান পড়ামাত্র কাজ হল। মা শান্ত হলেন।

অনেক রাত হয়ে গেছে। তাছাড়া ফেরার বাস বন্ধ। সন্ধের পর স্থানীয় মাস্তানদের সঙ্গে বাস কণ্ডাক্টরদের মারপিট হওয়ায় বাস কর্মীদের ষ্ট্রাইক।

'চিড়ে আছে ?'

আমি বললাম, 'রাঁধা অভ্যাস আছে। ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি।'

সোনা উঠে গিয়ে ঠুকে ঠুকে ঠিক তাক থেকে চিড়ের টিন বার করলে। কলাইয়ের বাটিতে চিড়ে ভিজিয়ে বললে, 'আমার ভেজা চিড়ে খুব ভাল লাগে। ঝামেলা করবেন না।'

বোধহয় সোনার সান্নিধ্যের দরুণ আমার ক্লান্তি একেবারে কেটে গিয়েছিল। পা টিপে-টিপে আমি পাশের ঘরে গিয়ে দেখি মায়ের ঘুম এসেছে, মৃদু স্বরে নাক ডাকছে। আমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বসি।

'আপনার কি মনে হয় না, এই যে আমরা একসঙ্গে বাস করি এটা একটা অভ্যেস মাত্র ? বরাবর ছেলেবেলা থেকে আমার কথাটা মনে হয়েছে।'

আমি সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা সামনে ঠেলে দিই। সোনা হাত তুলে সেটা সরিয়ে দিয়ে বললে, 'এই যে স্বামী স্ত্রী ভাই বোন ছেলে মেয়ে একসঙ্গে বাস করছে, যদি এরকম তাদের সুযোগ দিয়ে বলা হত যে তোমরা নিজেরা আর একবার বেছে নাও, যে যার মতো থাকো, তাহলে

দেখা যাবে কেউ আর আগের মতো থাকছে না। সবাই অন্যরকম কম্‌বিনেশানে থাকছে।'

একটু থেমে আবার বলল, 'আমার বাবাও তো জানেন ইস্কুলের হেডমাস্টার, খুব কারেক্ট, এমনি সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোন চরিত্রদোষ নেই। কিন্তু মা-র সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। দুজনেই যেন দুজনের কাছ থেকে সারাটা জীবন কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। একগাদা ছেলেমেয়ে করেছেন, কিন্তু সংসার করেননি। পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে ভালবেসে বসবাস করব, এ রকম কোন আইডিয়া কারও মাথায় নেই। আপনার বাবা চেঁচান, মা চুপ করে থাকেন। আমার ক্ষেত্রে মা চেঁচান, বাবা চুপ করে থাকেন। আর ছেলেবেলা থেকে এক কথা শুনে আসছি, দুজনের এক বক্তব্য, দুজনের বিবাহ হওয়ার ফলেই দুজনের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। তার আগের জীবনটা ছিল আলো আর গান।'

আমি ভেজা চিড়ে চিনি আর লেবু দিয়ে একটা কলাইয়ের পাত্রে দিই। পরম তৃপ্তির সঙ্গে সোনা খেয়ে এক গেলাস জল নিঃশেষ করে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, 'এবার দিন', তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে চোখ বোঁজে।

চোখ খুলে বলে, 'আমার অনেক সময় মনে হয়েছে—এর সমাধান কী? বিবাহ বিচ্ছেদ? তার মানে তো ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। আর তখন লক্ষ লক্ষ ভাঙা সংসারের সমস্যা স্তূপীকৃত হয়ে সমস্ত দেশটাকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে। আসলে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এর কোন সমাধান নেই।'

আমি কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকাই। বোধহয় আমার সে চাহনিতে কৌতূহলের সঙ্গে অবিশ্বাস মাখানো ছিল।

'আমি ও ব্যাপারটা অনেক ভেবে দেখেছি। আসলে মেয়েদের কখনই সমান পর্যায়ে দাঁড় করানো হয় না······'

'অথবা তারা দাঁড়ায় না।'

একটু অসহিষ্ণুভাবে সোনা বললে, 'ওটা একেবারে ভুল কথা।

মেয়েরা চান্স পায় না সমান পর্যায়ে দাঁড়াতে। প্রধানত আর্থিক কারণেই তারা স্বামীর গলায় ঝুলে থাকে। ঐ আর্থিক কারণটা যদি দূর করা যায় তাহলে দেখা যাবে তাদের সঙ্গে এক নতুন মৈত্রীর বন্ধন তৈরী হয়েছে।'

'ইউরোপে আমেরিকায়, আমাদের দেশেও প্রচুর পরিবার আছে যেখানে স্বামী-স্ত্রী রোজকার করে আর রোজ সন্ধেবেলা চুলোচুলি করে। ওটা বোধহয় ঠিক আর্থিক কারণ নয়। আরও অনেকগুলো কারণের ফল।'

আমার কথাটা লুফে নিয়ে সোনা বলে, 'সেই কথাটাতেই আমি আসছিলাম—অনেকগুলো কারণের ফল। কিন্তু সেই অনেকগুলো কারণ আমাদের বর্তমান সমাজ দূর করতে পারে না। তার জন্যে সমাজ পাল্টানোর প্রয়োজন, প্রয়োজন বিপ্লব।'

আমাদের মধ্যে এই একটা বিরোধ ছিল, মানুষের মধ্যে মানুষের সম্পর্ক, বিশেষ করে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে। আজ যখন তাকে একেবারে হাতের কাছে পাওয়া গেছে তখন এ ব্যাপারটা একটা ফয়সালা হয়ে যাক, এইরকম এক ইচ্ছের তীব্রতা বোধ করি।

'আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি মেয়েদের কী চোখে দেখেন?'

আমার প্রশ্নের জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিল সোনা, 'কমরেড হিসেবে। আপনি?'

'আমি? আমিও।' আমি পশ্চাদপসরণ করি। কারণ সোনার আর আমার মধ্যে কোন বিরোধের দেয়াল খাড়া হয় আমি তা চাই না। আমি কি করে বলি, মেয়েদের আমি দেখি ভাল খাদ্যের মতো, ফুলফুলে বিছানার মতো, অর্থাৎ এমন একটা সজীব আশ্রয় যা আমাকে বাঁচতে নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করে। আর মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারে কোন সরল সমীকরণ আমার ধাতে সহ্য হয় না। তাহলে কি যেসব দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে সেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কোন চিড় পড়ে না? আমার ভেতরে ভেতরে মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সেই যে কাগজে কাগজে সমাজতান্ত্রিক জগতে চিন্তার রেজিমেন্টেশানের কথা পড়ে আসছি,

সোনার কথা কি তারই প্রতিধ্বনি ? অর্থাৎ আমি দেশনেতা বলছি, তোমাদের ওসব ছেঁদো ব্যক্তিগত সমস্যা মিটিয়ে নাও আর অমনি আমাদের জীবনে পারিবারিক সুখ উছলে উঠবে ?

সোনা বললে, 'আমি হয়ত ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারি নি। বিপ্লবটা আসলে একটা স্বপ্ন, একটা লক্ষ্য। এই যে এত লড়ালড়ি রক্তপাত এগুলো কিন্তু আসলে কোনটাই বিপ্লবের গোটা চেহারা নয়, খুব আংশিক, আসল লক্ষ্য হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক—এখন যা বিকৃত। এক বুকচাপা একাকীত্বে মানুষ বাস করছে। সারাজীবন চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। আগে ধর্মকর্ম মানুষকে তার খোলস ছাড়তে সাহায্য করেছিল, মানুষ ভাবতে পারতো এই চব্বিশঘণ্টা অস্তিত্বের কোন বিশেষ রূপ আছে যে রূপের সঙ্গে ত্রিভুবন বাঁধা পড়েছে। সেই ধর্মবোধ এখন নিরস ছিবড়ে। মানুষের এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে, কার্ল মার্কস সেই ধর্মের স্রষ্টা। শুধু একা নয়, সবাই মিলে, সবাই হাত লাগিয়ে কাঁধ লাগিয়ে এই বাঁচার চেষ্টার মতো তাৎপর্যপূর্ণ আর কী থাকতে পারে ? এরই মাঝখানে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। মেয়েরা পরী নয়, তোয়ালের বিজ্ঞাপনের নায়িকা নয়, মেয়েরা এই সকলে মিলে বাঁচবার এক বিরাট অংশ। বিপ্লবের আসল মানে হল, এই সকলে মিলে বাঁচার চেষ্টা, এক সামগ্রিক যৌথ অস্তিত্ব। আপনার ভাল লাগে না এভাবে ভাবতে ?'

আমি ঠিক এই কারণে সূর্য ব্যানার্জির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধ করেছি। এমন সহজ সাধারণভাবে আমাদের মনের কথাগুলো সে ধরত এবং তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করত যে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারতাম না। আমাদের কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বাঘা বাঘা নামকরা বামপন্থী লোকজন যাদের নাম কাগজের পাতায় বেরোয় তাদের সঙ্গে আলাপে আমি ক্লান্তি বোধ করতাম। মানুষের মন বলে যে একটা বস্তু আছে, তার কতগুলো প্রকাণ্ড চাহিদা আছে, তার সমস্যাগুলো কখনো ঘুণাক্ষরেও আলোচিত হয়নি। যখন আলোচিত হয়েছে তখন কতগুলো বিকৃতিকে

ধিক্কার দেবার জন্যে। যেন বিকৃতি কাটানোই মনের জগতের একমাত্র কাজ, মনকে তাজা রাখতে, তার গোড়ায় জল ঢালতে কোন ভাবনার প্রয়োজন নেই।

এবং ঠিক এই কারণেই সেই দেয়ালে হেলান দেওয়া আমার নেতাটির জন্যে আমি উদ্বিগ্ন বোধ করি। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের যা চেহারা আমি জানি, তাতে আত্মজিজ্ঞাসার স্থান খুব কম। একটা সোজা নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে গড়গড় করে হেঁটে যাওয়া অথবা আত্মবিসর্জন দেওয়া ছাড়া বোধহয় দ্বিতীয় পথ নেই। সোনা যে নতুন পার্টির দিকে ঝুঁকছে, এবং মাঝে মাঝে যে নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা বলছে, সেখানে ব্যক্তির একমাত্র সার্থকতা সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হবার পারদর্শিতা। এ পারদর্শিতা ছাড়া অন্য কোন চিন্তার স্থান সেখানে নেই। মানুষের মধ্যে মানুষের যে গভীর ব্যঞ্জনাময় ছবি সোনার কাছে সাম্যবাদের লক্ষ্য বলে বিবেচিত, তা তার দলের বেশীর ভাগ মানুষের কাছেই অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা বা বিপজ্জনক শোধনবাদী দর্শনের প্রতিফলন নামে চিহ্নিত হতে পারে। আমার কেমনই মনে হতে থাকে যে রাজনীতির মূল আদর্শ যদিও গভীরভাবে মানবিক তবু বাস্তবে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় তাকে এইসব চিন্তা ভাবনার জাল থেকে মুক্ত হয়ে এক শাণিত তীক্ষ্ণ ও সাময়িক অবয়ব নিতে হয়। অর্থাৎ আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, আমাদের চারপাশের অভিজ্ঞতার ফরমূলা ছাড়া রাজনীতি অসম্ভব। আর সেই নির্দিষ্ট গাণিতিক ছকে সূর্য ব্যানার্জি পড়বে তো?

'দশবছর আগে বাবা বাড়ি বানালেন। সেই নীল দরজা জানলা আঁটা ঝকঝকে সাদা একতলা বাড়িটা আমাদের ভাইবোনদের কী ভালই যে লাগছিল! গৃহপ্রবেশের দিনটা বোধহয় আমার আজীবন মনে থাকবে।'

রাত বোধহয় বারোটা হবে। আমার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই। মনে হচ্ছিল যদি সারারাত এইভাবে আমরা কথা বলি, এইভাবে সূর্য ব্যানার্জীর গানের ঝড় চলতে থাকে, তাহলে তা থেকে আনন্দময় অভিজ্ঞতা

কিছু নেই। কোন একটা আধুনিক বাংলা কবিতায় সমুদ্রের নিঃশ্বাস ফেলার কথা পড়েছিলাম। আমি যেন সত্যি সমুদ্রের নিঃশ্বাস পড়ার আওয়াজ শুনছি, সেই ধীর স্থির স্বরের উত্থান পতন, মাঝে মাঝে যতি। অবিকল সেই রকম।

'সকাল থেকে লুচির গন্ধে বাতাস ভারি। আর সকাল থেকেই বাবা মা-র ঝগড়া। আমার মনে হতে থাকে আমরা পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করি পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা গড়ে তুলবার জন্যে নয়, পরস্পরকে কত ভাবে আঘাত করা যায় সে জন্যে। মনে হতে থাকে, ঘি আর দরজা জানলায় নতুন রঙের গন্ধ, শামিয়ানার নীচে নিয়ন আলো, জাঁক করে আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ানোর হাঁকডাক, এগুলো সবই অবাস্তব অথবা এগুলো বাস্তব কেবল একটা বড় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবির অংশরূপে। ঐ যাকে বলে চালচিত্র আসলে এগুলো তাই, মাঝখানে অসুর দুর্গার মতো বাবা-মা লড়াই করছে।'

আবার চুপ। আমি আবার অন্ধকারে কান পেতে থাকি সমুদ্রের স্বর শুনবার অপেক্ষায়। 'শ্যামলদাকে তো আপনি চিনতেন। এখন একটা স্কুটার করেছে। গেস্টকীন উইলিয়ামসের ছোটখাটো লেবার অফিসার। মজুর ঠেঙানো ছাড়া তার জীবনের একটাই উদ্দেশ্য দিদিকে পাহারা দেওয়া, কমবয়সী কোন ছেলের সঙ্গে কথা বললে খাপ্পা, কথা বন্ধ খাওয়া বন্ধ নাটক। অথচ দিদির সঙ্গে এমনি সম্পর্ক খুব ফিকে, যত দিন যাচ্ছে তত আরও ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এমন ভীষণ ভালবাসার এমন ভীষণ পরিণতি ভাবতে অবাক লাগে না?'

'হয়ত আমি এসব ব্যাপারে বেশি ভাবি। বিশেষ করে এখন যখন রাজনীতি একেবারে নির্দিষ্টভাবে মোড় নিচ্ছে নতুন দিকে, যখন আমাদের সকলকে এক নতুন আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়াতে হবে, তখন এই সব পারিবারিক ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো এত জোর না দিয়ে ভাবলেও চলে। কিন্তু এইরকম কোন স্তোকবাক্যে আমি বিশ্বাস করি না। বিপ্লবের কাছ থেকে আমার চাহিদা অনেক বেশী। তা যদি না হত

তাহলে তো রাবার কেমিক্যালেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। মাইনে-পত্তর তো খারাপ দেয় না। কী বলেন ?'

এতক্ষণ যে তন্দ্রায় আবিষ্ট হয়ে বসেছিলাম তা সামান্য চোট খায়। আমি আমার নেতার সঙ্গে সংলাপে উৎসাহী নই, তার স্বগতোক্তি আমি মনে মনে রেকর্ড করতে চাই। কারণ এ বিষয় আমি নিশ্চিত ছিলাম আমার যে ধরনের মেজাজ তাতে ঝাঁপ দেওয়া যায় না, তাতে হয়ত অনুভূতি আছে, তাপ অতাপবোধ আছে, কিন্তু যেখানে সক্রিয় কর্মের শরিক হবার আহ্বান, সেখানে আমি কতদূর সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারব সে সম্পর্কে আমার নিজের সন্দেহ ছিল। তাই সংলাপের স্থান এখানে নেই।

'মার্কসের আগে পৃথিবীকে অনেক দার্শনিকই ব্যাখ্যা করেছিলেন কিন্তু পৃথিবীকে বদলাবার কথা কেউ বলেন নি। আমরা আজ নতুনভাবে পৃথিবীকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বদলাবার কথা বলছি। নিজেদের না বদলালে কিছু হবে না। দেখছেন না, গত এক বছর দুবছরে এই বামপন্থী নেতাগুলো কিরকম মূর্তিমান আস্ফালনে পরিণত হয়েছে ? শেষপর্যন্ত তারা এই সমাজব্যবস্থারই অলঙ্কাররূপে শোভা পাচ্ছে। তাই না ?'

অনেক রাত হয়েছে। আমরা দুজনে গুটিসুটি মেরে তক্তাপোষে শুয়ে পড়ি। মাঝরাতে ঝড় ওঠে। দরজা জানলা পড়ে, মেঘ ডাকে। ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসছিল। আমি উঠে জানলা বন্ধ করে দিতে গিয়ে দেখি সোনা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। ঘুমটা আমার খুব তেড়ে এসেছিল। বললাম, 'এখনও দেরী আছে, শুয়ে পড়ুন।'

'যাচ্ছি, আপনি যান।'

ঠিক সময়ে আমার ঘুম ভাঙে। আট দশ বছরের অভ্যাস। বাহিরে কার্তিকের ক্যাবিনে যেই উনুনের ধোঁয়া দেয় অমনি আমি উঠে পড়ি। চান করে আসতেই সোনা বললে, 'আমি আর চান করছি না। ফ্যাক্টরি

গেটে চা খেয়ে নেব। স্টেশনে দেখা হবে।'

তারপর একটু এগিয়ে ফিরে এসে বুকপকেট থেকে একটা ছোট ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললে, 'সেই বহুপুরনো ব্যাপারটা নিয়ে আজ ভোরে একটা কবিতা লিখে ফেললাম। ঘুম আসছিল না তাই। আপনার কাছেই থাক।'

আমার কাছেই আছে সেই ভাঁজকরা কাগজখানা। আমি জানি না সেটা কবিতা না কী। কবিতা সম্পর্কে আমার খুব একটা আগ্রহ ছিল কিংবা আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমার চারপাশের যা পরিবেশ, দেশকালের যা পরিস্থিতি, তাতে অনেক বিখ্যাত লোকজনের ছাপানো লেখার চেয়েও সেই ভাঁজকরা কাগজের লাইনগুলো আমার কাছে জীবন্ত লাগছিল। কবিতা হোক কি না-হোক, তা সূর্য ব্যানার্জীর চেহারাটা আমার সামনে স্পষ্ট আরও প্রাণবান করে তুলেছিল। আমি একটা লাইন এদিক ওদিক না করে যেমনটি সেই কাগজখানায় লেখা ছিল ঠিক তেমনিভাবে নকল কবে লিখছি।

ভালবাসা প্রকৃতিতে।

বর্ষণ-অতিক্রান্ত সূর্য থেকে শুষে নিলাম উদার উত্তাপ। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে আকুল আশা আষাঢ়ের শ্রাবণের। মাঠে গাছে রাস্তায় নয়ান-জুলিতে মৌসুমী মেঘ যখন ঝরে ঝরে পড়ে। কচি কচি ছেলেমেয়েদের দৌড়নোর শব্দে জাগে ভালবাসা। ভালবাসা আকাশের নীলে, বনস্পতি সবুজে, মেঘে, বজ্রে বিদ্যুতে, পূর্ণিমার আকাশের চাঁদ আর হাল্কা মেঘের খেলায়, অমাবস্যার অন্তহীন আঁধারেও ভালবাসা। ফুলফোটার শব্দে, সন্ধ্যাতারার হাতছানিতে, যেমন ঘাসের আগায় এক ফোঁটা শিশিরে বিচ্ছুরিত সূর্যালোক। ভালবাসা প্রকৃতিতে, প্রত্যয়ে॥

ভালবাসা কর্মে।

মাটিতে বীজ বুনে, বঙ্কিম বলরাম কটি জানুর অসহ্য বেদনায় জলে ও কাদায় রোওয়া কচি চারা, চোখে খরা কিংবা বন্যার সংশয় নাচে অহরহ।

তারপর কার্তিকে, অঘ্রাণে ধান ঝাড়ার গন্ধে ভাপানোর শব্দে ভরে ওঠে বুক—বুকভরা নিঃশ্বাসে। যদিও উপোসী উদর কাঁদে যমযন্ত্রণায় সম্বৎসর। ঘড়ির কাঁটার মতো অবিরাম নিয়মিত ছন্দিত মেশিন, তার তালে হাত ওঠে হাত পড়ে সকালে সন্ধ্যায় নিষ্পলক রাত্রে। ভরে ওঠে ভূগর্ভে সুরক্ষিত গুদাম। সপ্তাহান্তে মিল গেটে কাবুলী কাড়ে মালিকের অনাগ্রহী দান, রিক্ত রেশনের থলি ঝোলে বস্তিতে সার সার। কৃষক শ্রমিকের স্বেদে রক্তে গড়ে ওঠে সভ্যতা, জ্বলে নিওন—দিল্লী বোম্বাই কলকাতায়। অন্নদাতার অন্ন নেই, বস্ত্রদাতাব বস্ত্র নেই লজ্জা ঢাকবার। তবু সত্যি ভালবাসা কর্মে ঘর্মে॥

ভালবাসা মানুষে।

অসহ্য পুলকে যন্ত্রণায় আমাদেব জন্ম দেয় মা, হয়তো জন্মান্ধ তবু প্রসারিত হয় আরও এক প্রাণ, আবও এক ভালবাসার আধার। ভালবাসা বেড়ে ওঠে বর্ষার লতার মতো প্রীতিতে সখ্যে সেবায়। মায়ের শীতল হাত জ্বরতপ্ত কপালে, বন্ধুব উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আবাব কড়া নাড়ায় বন্ধ দরজায়। ভালবাসা সেই নারীর স্তনের উত্তাপে, জঙ্ঘার অতল অন্ধকারে, যে জোগায় নৈমিত্তিক প্রেরণা মিলনে বিচ্ছেদে শরীরে মননে, সংলাপে অববে। ভালবাসা খিন্ন আজ অন্নের অভাবে, ভালবাসা ছিন্ন হল সত্যের হত্যায়। তবু সত্যি ভালবাসা মানুষে মানসে॥

ভালবাসা শিল্পে।

বেহালায় করুণ বৃষ্টির মতো ঝরে সুব, সানাইয়ে উদাস হয় বৈরাগী মন। রবীন্দ্র সঙ্গীতে ভাসে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, বাউলের গানে যেন গোটা দৃশ্যপট রূপ পায়, দুর্যোগের রাত কাটে গণনাট্য গানে। ভালবাসা গোর্কীর নীচুতলার মানুষে, বালজাকের নির্ভীক কলমে, জীবনকে জানাব অন্তহীন প্রচেষ্টায় লেখকের। ভালবাসা ছড়ানো কোনার্ক দেউল থেকে অজন্তা ইলোরায়, পিকাসোর রঙে ও রেখায়। ভালবাসা শিল্পে সৃষ্টিতে॥

ভালবাসা সংগ্রামে।

লাখ লাখ মানুষের ভুখা মিছিলের কলরবে বাঁশপাতার মতো কাঁপে অসহ্য ভালবাসা স্লোগানে পদধ্বনিতে। ভালবাসা জেলে বন্দী কমরেডের উষ্ণ শোণিতে, সাঁওতাল বিদ্রোহে, তেলেঙ্গানায়, নুরুলের মৃতদেহে, নকশালবাড়ি ফাঁসিদেওয়ার জঙ্গলে পাহাড়ে। ভালবাসা প্যারী কমিউনের শ্বাসরুদ্ধ দিনগুলোয়, মে দিবসের চিকাগোয়, রাশিয়ায় দুনিয়া কাঁপানো দশদিনে, চীনে উনপঞ্চাশের অক্টোবরে। ভালবাসা সংগ্রামে সংহারে॥

ভালবাসা প্রকৃতিতে, কর্মে, মানুষে, শিল্পে, সংগ্রামে, ভালবাসা অংশে অখণ্ডে, প্রাণের উদাত্ত প্রকাশে॥

আমি সেই ভাঁজকরা কাগজখানায় পুঁটেপুঁটে করে লেখা কালি ঘাম ধেবড়ানো লাইনগুলো হুড়মুড় করে পড়ে ফেলেই প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা বোধ করি। আজ নিশ্চয় ট্রেন ফেল্। কার্তিকের ক্যাবিনে ঠোঁট পুড়িয়ে এক কাপ চা খেয়ে ঘুমন্ত মা-র হাতখানা একবার চাপ দিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরোই। প্ল্যাটফর্মে আসতে না আসতেই ট্রেন ছাড়ো ছাড়ো। 'এদিকে এদিকে!' ভিড়ের মধ্যে থেকে সোনা হাঁক দেয়। আমি পড়ি কি মরি করে সেদিকে ছুটি। কিন্তু অল্পের জন্যে ট্রেন ফেল্ করলাম। সোনার হাত নাড়ানো অনেকক্ষণ আকাশে আটকে ছিল। আমার এত বছরের চাকরির জীবনে সেদিন প্রথম মাইনে কাটা গেল।

৫

আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট বোধ হচ্ছে। এ গল্পের নায়ক আমার বন্ধু, আমার নেতা সূর্য ব্যানার্জি, আমি নই। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে লেখার হরফে আমি নিজেই অনেকখানি অংশে জুড়ে আছি। এটা আমার লেখার অভ্যাস অথবা শিক্ষার অভাব হতে পারে। কিন্তু আমার সবচেয়ে আপত্তির কারণ হবে যদি কোন পাঠক মনে করেন আমি আমার বন্ধুর কাহিনী লিখতে গিয়ে আত্মকথা লিখতে বসেছি। কারণ এটুকু আমার বুদ্ধি আছে বুঝতে যে, আত্মকথা তখনই সার্থক যখন তা নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ নিজের বাড়ি ঘরদোরের সঙ্গে যেখানে গোটা পৃথিবীটা বাঁধা পড়েছে। পলিথিন কারখানার কর্মী, রাজনৈতিক জগতের ভবিষ্যৎ নেতা ও কবি সূর্য ব্যানার্জির জীবনে আমি এই নৈর্ব্যক্তিকতা বরাবর লক্ষ করেছি। বরাবর তার চিন্তা, তা যতই আত্মকেন্দ্রিক হোক, নিজের ঘরের চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ নয়। যাঁরা প্রবন্ধ লেখেন তাঁদের ভাষায় বলতে গেলে, তার আত্মজিজ্ঞাসা ও সমাজজিজ্ঞাসা একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মতো লোকজন যারা দেখে বিচার করে তাদের সঙ্গে প্রাক্-মার্কস দার্শনিকদের একটা মোদ্দা মিল আছে। আমরা কেউই পরিবর্তনের যে কঠিন নিষ্করুণ প্রক্রিয়া তাতে ঝাঁপ দিই না। আগেকার দার্শনিকদের তাৎপর্য ছিল কিন্তু এখন আর ততোটা নেই। তেমনি আমার জীবনের বোধহয় খুব একটা তাৎপর্য নেই। এবং সেই তাৎপর্যহীনতা সম্পর্কে সচেতন থাকার ফলেই আমাকে সূর্য ব্যানার্জির চারপাশে আমার বিপরীত রঙে মেলে ধরতে চাই। যেমন ছবিতে হয় কোন একটা রঙের তাৎপর্য বুঝতে গেলে আর একটা ভিন্ন রঙের প্রয়োজন। আমি কেবল সেই ভিন্ন রঙ, আসল রঙটা বোঝাবার জন্যে।

সেদিনের মাইনে কাটার জন্যে আমার দুঃখ নেই। সে রাতের অভিজ্ঞতার যে অবর্ণনীয় আনন্দ তা আমার স্মৃতিতে ফিকে হতে বহুদিন

লাগবে। তাছাড়া আমার নিজেকে বুঝতে, বিশেষ করে আমার ও বিনতার সম্পর্কটা বুঝে নিতে সে রাতের অভিজ্ঞতা আমাকে সাহায্য করেছিল। বিনতার সঙ্গে সম্পর্কটা যেমন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল তেমনি তাতে প্রকাণ্ড অনিশ্চিতির ছায়া পড়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় আমার ঘন ঘন চুম্বনের পরও তার বিষণ্ণতা কাটে নি। এক নতুন অস্থিরতা লক্ষ করলাম তার চোখে। মাতুরে বসেছিলাম। বাহিরে ফটফটে চাঁদনি। তুটি কমিউনিস্ট দল যারা কিছুদিন আগে পর্যন্ত এক সঙ্গে চলাফেরা করত, যাদের কর্মীরা ছিল পরস্পরের আশ্রয়, তারা তুদিন হল আমাদের পাড়ার একটু বাহিরেই লড়াই করছে। দূর থেকে ভারী বোমার আওয়াজ শোনা যায়।

'তুমি আমাকে কেন বিয়ে করবে না জানি', বিনতা তার হাঁটুর ওপর মাথা রেখে আস্তে আস্তে বললে।

'তুমি কিচ্ছু জানো না, তুমি একটা বোকা মেয়ে।' আমি তার চুলের গুছি টেনে বললাম।

'আমি তোমার মা-র মতো বিতুষী না হতে পারি, কিন্তু কে আমাব সম্পর্কে উদাসীন সেটা অন্তত বুঝতে পারি।'

আমার একটা ঘায়ের ওপর যেন কারুর নখ পড়ল। মায়ের সঙ্গে বিনতার এক তীব্র অন্তর্লীন বিরোধ আছে তা কখনই কথায় প্রকাশ পায় নি। বিনতাই প্রথম প্রকাশ করলে।

'আমার মা বিতুষী নন, কিন্তু বুদ্ধিমতী।'

'ঐ একই কথা', বিনতা অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়লে।

'কী কথা ?' আমার গলা বোধহয় চড়ে গিয়েছিল। বিনতার চোখে ভয় লক্ষ করলাম।

'কিছু না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে।

ভালোবাসা বেড়ে ওঠে বর্ষার লতার মতো প্রীতিতে সখ্যে সেবায়— সোনার কবিতার লাইনটা মনের মধ্যে নড়েচড়ে ওঠে। কবিতা মানে কি ভাল ভাল কথা যেগুলো আসলে প্রাত্যহিক জীবনে অচল অথবা রঙে

গন্ধে ভরপুর ফুলের তোড়া রাত্রিশেষেই যা বাসি ?

আমি বিনতার হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে বসে থাকি। হাতে গরমজলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ায় বুঝতে পারলাম সে নিঃশব্দে কাঁদছে।

আমি তাকে আরও কাছে টানবার চেষ্টা করতেই সে হঠাৎ তড়াক করে উঠে বললে, 'যাঃ, ভুলেই গেছি! ভাতটা পুড়েই গেল বোধহয়।' ক্ষিপ্র পায়ে সে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে যায়। আবার ভারী বোমার আওয়াজ আর কোলাহল ভেসে আসে।

আমি মা-র কাছে আসি। মা অনেকটা ভাল। আবার স্বাভাবিক-ভাবে কথা বলতে শুরু করেছেন। বাবা যাবার পরই কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাতের ব্যথাটাও অনেক কম।

'মাছটা ভাল ছিল ?'

বেশীর ভাগ দিনই মা বাজার করে আনেন। এ অঞ্চলে মহিলাদের বাজারে ক্রেতা হিসেবে গোড়াপত্তন মা প্রথম করেন।

'চমৎকার! খুব ভাল ছিল মা···আমি বিনতাকে বিয়ে করছি।' প্রবল উৎসাহের তোড়ে হঠাৎ বলে ফেলি।

'সে কী ? মা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর চুপ করে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'তোরা বড় হয়েছিস। নিজেরা বুঝবি। আমাকে আর এর মধ্যে জড়াস নে।'

মা যে আমার প্রস্তাব ভালভাবে গ্রহণ করেন নি তা আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে গেল। আমি তাঁকে জানতাম। তর্ক করে আমার কাছে যা ভাল তা ভাল বলে প্রমাণিত করার পদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। কিন্তু তাঁর এ মেজাজের সঙ্গে আমি খুব পরিচিত থাকলেও তাঁর বিস্ময় এবং তাঁর ঔদাসীন্য আমাকে বিরক্ত করে। বাবার কথাগুলো হঠাৎ অর্থবহ হয়ে ওঠে। মা কি মনে করেন আমি আজীবন তাঁর জীবনের সঙ্গে লেপ্টে থাকব ? তাঁর একাকীত্বের গুরুভার আমিও বইব তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ?

'আমি জানি বিনতার ব্যাপারে তোমার কেন আপত্তি। তার বাবা

ট্যাক্সি ড্রাইভার—এই জন্যে তো।'

মা স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমার ভয় হল, আমি বোধহয় বাবা হয়ে গেছি, অন্তত এভাবে কথা আমি কখনও মা-র সঙ্গে বলি নি।

'আমার বাবা খুব বড়লোক ছিল না। লোকটা খুব ঠাণ্ডা শান্ত ছিল, তুই তো তাকে দেখিস নি। দেখলে এরকম বলতিস না।'

'তোমার ইচ্ছে করে না আমি বিয়ে-থা করে আর পাঁচজনের মতো সংসারী হই ?'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি জানি, আমার সব ইচ্ছেটিচ্ছেগুলো শুকিয়ে গিয়েছে। আগে অনেক ইচ্ছে ছিল। এখন খুব ভয় করে। ভয় হয়, আমরা যা হয়েছি, তোরাও তাই হবি।'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'আমরা তা হব না, তার আগেই আলাদা হয়ে যাব।'

'কি জানি, হয়ত তুই ঠিকই বলছিস। কিন্তু আমার ভয় করে। রাত জেগে 'চয়নিকা' পড়তাম। বুকের মধ্যে প্রকাণ্ড অস্থিরতা বোধ করতাম। চারপাশে যত অব্যবস্থা, যত বাজে ব্যাপার সবগুলো মনে হত আসলে নেই, আসলে আছে আকাশভর্তি তারা, বর্ষার মেঘ আর বোঝে ভাবে এমন সব হৃদয়বান মানুষ। তারপর দেখলাম, সব ঠিক আছে,—আকাশ ভর্তি তারা আছে, বর্ষার মেঘ আছে কিন্তু সেই বোঝে ভাবে এমন সব মানুষ কোথাও নেই। সেদিন সোনা এসেছিল, জানিস ?'

'কবে ?' আমি চমকে উঠলাম।

'পরশু, তুই বেরিয়েছিলি। তোকে বলতে ভুলে গেছি। ঠিক এই সব কথা আমাকে বললে। মানুষগুলোকে বদলাতে হবে, তারা যাতে বুঝতে পারে ভাবতে পারে, তাহলেই বাঁচার একটা মানে হয়। নইলে বাঁচার কোন মানে নেই। এই সব কথা।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, তুই কি বিনতার কথা ওকে কিছু বলেছিস ?'

আমি ভীষণ চমকে উঠি, 'কই, না তো !'

'আমার কিন্তু মনে হল, তুই ওকে বলেছিস।'

'কী বললে ও?' আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করি।

'ও বললে, মানুষের কতগুলো প্রাথমিক চাহিদা আছেই, সেগুলো থেকে তাকে বেশীদিন বঞ্চিত রাখলে নানারকম গণ্ডগোল ঘটে। বললে, যে খুব সৌখীন পোষাক পরত, সে কম দামী জামাকাপড় পরতে পারে, যে খুব ভাল খেত, সে অতখানি ভাল না খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সে এমন কিছু করতে পারে না যাতে একেবারে অন্যরকম হতে হয়।'

'তার মানে?'

'যেমন সে বিয়ের কথা বললে। এমন একটা সময় আসে যখন আর একজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন। এ প্রয়োজন অস্বীকার করে বেশীদিন চলা যায় না। আমি তখন ওর নিজের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ও কি নিজে বিয়ে-থার কথা ভাবছে? আমার প্রশ্নের জবাবে ও কী সব বললে।'

'কী বললে? আসল কথাটাই বাদ দিয়ে যাচ্ছো।'

'ও বললে, ওর এখনও সময় হয় নি। কিছু কিছু লোক থাকবেই যাদের সামনে অন্য কাজ এত জরুরী যে, এ সব প্রশ্নগুলো বড় হলেও অপেক্ষা করতে হবে। সব জিনিষ এক সঙ্গে করতে পারা যায় না।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'তুমি হয়ত ভুল শুনেছো মা, সোনা আমাকে বরাবর বলে এসেছে, সব জিনিষ একসঙ্গে করতে পারা চাই।'

মা চুপ করে থাকেন। আমি লজ্জাবোধ করি বিনতার প্রসঙ্গে যে উত্তেজনা দেখিয়েছিলাম সে জন্যে। সত্যিই এটা ঠিক কথা নয়। ট্যাক্সি ড্রাইভারের মেয়েকে বিয়ে করছি শুনলে বাবা মর্মাহত হবেন, হয়ত ভণ্ডুল করে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন, নিজেই পাত্রী চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন, কিন্তু মা-র সমস্যা অন্য। যে ছায়া তাঁর জীবনে পড়েছে, তিনি চান না সেই ছায়া আবার আমার জীবনে পড়ুক।

আমি সাবধানে বলি, 'তুমি একবার বিনতার সঙ্গে কথা বলো না।'

'তা বলতে পারি, কিন্তু তাতে কী হবে? বিয়ের পর তোর বাবাকে

রাজপুত্তুর মনে হত। বেশ ষণ্ডা গাণ্ডা দামালে ছিল। গাড়ি ভাড়া করে দিল্লী আগ্রা ঘুরালে, পাহালগামে কটেজ নিয়ে থাকলে, সালোয়ার কামিজ পরিয়ে তুললে আমার বিরাট রঙীন ছবিটা, সেটা আমি ভেঙে ফেলেছিলাম, তার বৈঠকখানায় রেখেছিল। তার ঐ দামালে একরোখা ভাবটা আমার ছিল না, আমি বরাবর ভীতু ধরনের ছিলাম, বড্ড নিজের মধ্যে নিজেকে নিয়ে থাকতাম। ভাবতাম, তোর বাবার মেজাজটাই আসলে জীবনের লক্ষণ। আসলে মানুষ যতো ছোট্ট হতে থাকে তার দাপানি আরও বেড়ে যায়, একথাটা বুঝতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।'

'তখন তুমি চলে এলে না কেন?'

'ওটা ঠিক এখনকার গল্পের মতো হয় না।···যাই হোক, সে সব তো হয়েছে। আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম, আলাপ-সালাপ করে কিছু বোঝা যায় না মানুষকে। তুই যখন বলছিস, তখন আমি নিশ্চয় মেনে নেব।'

'এটা তোমার মনের কথা নয় জানি।'

মা আমার কথায় কান না দিয়ে বললে, 'সোনা, আমায় তার নতুন পার্টির কথা বললে।'

আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠি এবং সঙ্গে সঙ্গে আহতও হই। কারণ এ ব্যাপারে হঠাৎ আমার মা-কে এত অন্তরঙ্গ ভাববার কী কারণ থাকতে পারে বুঝে উঠতে পারি না।

আমার মুখের বিহ্বলভাব লক্ষ করেই মা বলেন, 'না না, কোন কাজের কথা নয়। ওরা মেদিনীপুর গিয়েছিল সেখানকার একটা ঘটনা।'

আমার আহতবোধ আরও তেজীয়ান হয়ে ওঠে। সূর্য মেদিনীপুরে যাতায়াত করছে, এ ঘটনা আমার কাছে প্রকাশের প্রয়োজন মনে করেনি, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু একেবার নন্-পলিটিক্যাল আমার মাকে এসবের মধ্যে জড়ানো কেন? এটা কি তার পক্ষে বিচ্যুতি হচ্ছে না?

মেদিনীপুরের এক গাঁয়ে ওদের পার্টির এক সিম্প্যাথাইজারের বাড়ি

ওরা উঠেছিল। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, বলেছিলেন বিপ্লবীদের বিয়ে-থাওয়া করার কথা, সংসারী হবার কথা। ওদের পার্টির অনেকেই প্রতিবাদ করেছিল, সোনা কিন্তু করে নি। সে-ই কথাটা বলছিল, বোধহয় তোর বিয়ের ব্যাপারটা ভালভাবে মেনে নিই বলে।'

আমি এক চাপা প্রতিবাদের উষ্ণতায় আচ্ছন্ন হই। 'আমার কথা কেন উঠবে ? আমি তো, আমি তো বিপ্লবী নই। যারা বিপ্লবী তাদের প্রসঙ্গে কথাটা উঠছে।'

মা আমার উত্তেজনায় অবাক হয়ে বললেন, 'না না, ওরকম আলাদা করে সোনা বলে নি। ও বলেছিল, মানুষ কম খেতে পারে, ছেঁড়া জামা রিপু করেও পরতে পারে, কিন্তু তার জীবনের যেসব মূল চাহিদা তা পাল্টে দিতে পারে না।'

আমি চটে গিয়ে বললাম, 'তাহলে বিপ্লবটা করবে কে ? সবাই যদি গেরস্থালি করে, ছেলে পড়ায়, মাসের শেষে বাজারের খরচের জন্যে শূন্য বাক্স হাতড়ায়, তাহলে সমাজ পাল্টানোর কথাটা কি বাৎ কি বাৎ হয়ে দাঁড়ায় না ?'

মা চুপ করে যান। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'ওসব আমি জানি না। যখন সোনা বলছিল তখন মনে হচ্ছিল, ওব বিপ্লবটা না হওয়ার জন্যেই আমাদের সবকিছু আটকে আছে। আসলে কিছুই আটকে থাকে না, সব চলে। সবই চলে সংসারের নিয়মে।'

'সে নিয়মটা কী ? সে নিয়মটা বিপ্লব বাদ দিয়ে নয়।'

কথাটা শেষ ক'রেই আমি খোলা দরজার দিকে চাই। এতক্ষণ লক্ষ করি নি একটা লম্বা ছায়া ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। দেখামাত্র চমকে উঠি। সোনা এগিয়ে এসে বলে, 'ঠিকই বলেছেন। বিপ্লব তো জগতের নিয়মকে বাদ দিয়ে নয়।'

সোনা আমার পাশে ধপ করে বসে পড়ে চেঁচিয়ে বলে, 'বড্ড ক্ষিদে লেগেছে মাসীমা, কিছু খাওয়ান।'

আমি একটু অবাক হই। ঠিক এই ধরনের সামাজিকতা যা বাংলা

ফিল্মে ও গল্পে চালু, তাতে সোনা বিশেষ অভ্যস্ত নয়। সোনা সকলের চাহিদা মিটাতে অভ্যস্ত, নিজের চাহিদা সে সচরাচর কাউকে জানায় না। আমার আন্দাজ হয় তার সাম্প্রতিক অস্তিত্বের অব্যবস্থাই তাকে এরকম অহেতুক সামাজিক জীবের পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে। কিছুকাল হল তার কাজের সুবিধের জন্যে সে কারখানার কাছাকাছি একটা মেসে ঘর নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর মা মুড়ি আর ডিমভাজা নিয়ে আসেন। মুঠো করে মুড়ি খেতে খেতে সোনা বললে, 'আমার কিছুদিন হল, ছেলেবেলার কথা বড্ড মনে পড়ছে। আমি বোধহয় আপনাকে কখনও বলি নি—না?'

আবার আমি অসোয়াস্তি বোধ করি। আমরা এতদিন পর্যন্ত যে বামপন্থী রাজনীতিতে ডুবেছিলাম এবং যে রাজনীতি মন্ত্রিত্বের গদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায়, আমরা এক বিরাট স্বপ্নভঙ্গের পর্যায়ে আলোড়িত হচ্ছি সেই আলোড়নই কি সোনার ক্ষেত্রে আরও বিশ্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়াচ্ছে? কারণ এই ধরনের আলোচনা তো আগে ও এড়িয়ে চলেছে। কবিতার দিকে ওর ঝোঁক বরাবরই কিন্তু কবিতা আলোচনা বাদ দিলে ও খুব সাদামাটা গদ্যময় মানুষ। আমার ওর গদ্যময়তা ভাল লাগে, বলতে কি আমি ওর কবিতার মেজাজটা ভয় পাই।

মা পাশের ঘরে চলে যাবার পর সোনা আবার সুরু করে, 'আপনি নিশ্চয় খুব অবাক হচ্ছেন আমার কথাবার্তা শুনে। এই সব কথা যাকে আমরা এককালে নন-পলিটিক্যাল কথাবার্তা বলতাম—তাই না?'

'না না, ঠিক তা নয়, তবে…'

'কোন কিছুর তবে নেই। মানুষের মনের কোন অভ্রান্ত লাইন নেই। যেন কেবল সেই পথে হাঁটাই কেবল হাঁটা। আমি যেমন আমার শৈশবের কথা ভাবি, আপনি হয়ত ভাবেন না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। তাতে—', এই পর্যন্ত বলে সূর্য ব্যানার্জির চোখ দুটো বিদ্রূপে চকচক করে, 'তাতে বিপ্লবের পথ ত্বরান্বিত হয় কিংবা হয় না বলা যায়?'

আমি চুপ করে থাকি। আমার বন্ধু ও শিক্ষকের সঙ্গে আলাপে

আমি অনেক সময়ই প্রতিবাদ করি, এটা সোনা জানে। সেই জন্যে কখনও মাথা-নাড়া নির্বিবাদ উদ্ভিদসদৃশ সম্পর্ক আমাদের মধ্যে ছিল না। আমি তার সঙ্গে তর্ক করতাম যেন নিজের কাছেই নিজের ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়ার জন্যে।

'এখন যেখানে মুক্তিযুদ্ধ চলেছে সেই শ্রীকাকুলমের কাছে আমার শৈশবের বেশ কয়েকটা বছর কেটেছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী?'

'উড়িষ্যার শেষপ্রান্তে পার্লাকামিডি স্টেটে বাবা হঠাৎ মাস্টার হয়ে গিয়েছিলেন। ছোট্ট ছবির মতো শহর, পাহাড় আর জঙ্গল। কিন্তু বাবা আবার ভিউ ভালবাসতেন। শহরের শেষে একেবারে ফাঁকায় বাসা নিয়েছিলেন। সন্ধে ছটার পর রাস্তায় বাঘ বেরোত। আমি সারা দুপুরটা কাটাতাম একটা বিরাট মাঠ পেরিয়ে সামনে পাহাড়টার গায়ে। সে পাহাড়টা তেমন জংলা নয়। কিন্তু উল্টো দিকের পাহাড়টার গা দেখে মনে হোত যেন নিগ্রোর মাথা। ঘন কালচে কোঁকড়ানো সবুজে সমস্ত পাহাড়টা ঢাকা। দু-তিন মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, 'আর ঠিক একই সময়ে, বোধহয় তখন একটা বাজে, নীল শাড়ীপরা তের-চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে রোজ হাতে বইখাতা নিয়ে ফিরত স্কুল থেকে। অনেক দূর থেকে তার আবির্ভাব, তারপর কাছে এসে আমার দিকে একবার তাকানো, শাড়ীটা আর একবার গায়ের সঙ্গে পেঁচিয়ে বইখাতা হাতবদল করা, তারপর আবার পাহাড়ের পেছনের গায়ে মিলিয়ে যাওয়া—এই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে লাগতো পুরো এক ঘণ্টার ওপর। এরকম বেশ কয়েক মাস চলছিল তারপর হঠাৎ তার আসা বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেবেলার অনেক কথা ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এখনও চোখ বন্ধ করলে সেই ঘন কোঁকড়ান সবুজ বনে ঢাকা পাহাড় আর সেই নীল শাড়িপরা মেয়েটার মুখ আমি ভুলতে পারি না।'

'কৃষিবিপ্লব না করে আপনার কবিতা লেখাই উচিত ছিল।'

সোনা হেসে বললে, 'মাও সে তুং-ও তো কবিতা লিখতেন। লেনিনের কবিতা পড়েন নি? আর হো চি মিন কবিতা লিখতেন না? বিপ্লবকে বিরাট রূপ দিতে গেলেই কবিতার দরকার।'

'কি জানি মশাই, আমার কিন্তু মন সায় দেয় না। বিপ্লবের এক প্রচণ্ড কেজো চেহারা আছে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে প্রকাণ্ড মানসিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন। এখানে কবিতায় পেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। আপনার এই শৈশব প্রীতি আমার পছন্দ নয়। এইসব স্মৃতি মানুষকে শুধু পেছনের দিকে টানে। আমাদের দরকার এমন কিছু যা আমাদের সামনের লক্ষ্যে দৌড়ে পৌঁছে দেয়। তার জন্যে আমাদের যদি কেউ বলে কট্টর কমিউনিস্ট তার জন্যে কিছু এসে যায় না। বলে বলুক।'

সোনা সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'আপনার কথাটা আমার চারপাশ থেকে শুনতে পাচ্ছি। মনটাকে যদি ছেঁটে কেটে দিয়ে বিপ্লব করা যেত তাহলে খুব সুবিধে হত। কিন্তু ওরকম ছাঁটকাট শেষ পর্যন্ত টেঁকে না। মানুষকে তার সবশুদ্ধ নিয়েই এগোতে হয়। তাহলেই সেই এগোনটা এগোন। মানুষের জন্ম মৃত্যু অস্তিত্ব তার সংগ্রাম তার কৃষিবিপ্লব এমন কি তার খতমের অভিযান সবই এক নিরবচ্ছিন্ন কবিতা। সমস্তটাই তাকে জোয়ারের মতো ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমার একটা স্মৃতি হোল আমাদের কারখানার গেটের কাছে চায়ের দোকানের মানিক দাস। মানিককে আমি রাজনীতিতে নামাই। দু'বছর আগে ছাঁটাই হবার পর দোকান দিয়েছে। আমার সবচেয়ে দুঃখের সময় দেখলাম যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বছরের পর বছর সংগ্রাম করেছি, তারা সবাই মন্ত্রীদের সাকরেদ হবার জন্যে ছুটেছে। সেই সময় একবার ভেবেছিলাম সবকিছু ছেড়ে দেব, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে রিষড়া স্কুলের অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার আমার বাবার মতো অবিকল বনে যাব। বিপ্লব যখন কথার ফুলঝুরি মাত্র তখন সংসার ধর্ম চাকরি আরও একটা সলিড ব্যাপার। কিন্তু আমি পারি নি। তার কারণ জানেন? কারণ আমার স্মৃতি।

আমার স্মৃতিতে কারখানার ফিটার মানিক দাস কাঁচের গেলাসে চা ঢালছে। আমি কি করে আমার বাবা হব?'

'কিন্তু আপনার শৈশব?'

'শৈশবও তাই। শৈশবও আমাকে বেঁচে থাকতে, আমাকে নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করে।'

'আশ্চর্য! একেবারে কবিতার ভাষা বলছেন মশাই।'

'মিথ্যে বলছি?'

'মিথ্যে বলবেন কেন?'

সোনা হেসে বললে, 'কবিতা সম্পর্কে আপনার ধারণা একেবারে ভুল। বোধহয় ভুসি কবিতা খুব পড়েছেন যেমন পাঠ্যপুস্তকে লোকে পড়ে। আসলে সত্যি কথা সবচেয়ে ভালভাবে কবিতায় বলা যায়।'

আমি একটু সাবধানে বলি, 'আপনি যাদের সঙ্গে কৃষিবিপ্লব করতে চলেছেন তারা এই রকম ভাবে?'

অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে সোনা বললে, 'তারা শেষ পর্যন্ত এই রকমই ভাববে। এই রকম না ভাবলে চলবে না।'

৬

আজ কারখানা ছুটি ছিল। মা কিছুদিন হল মামার বাড়ি গেছেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে হয়ত ফিরবেন না। বিনতার সঙ্গে মা ঠিক সমান তালে পা ফেলতে পারলেন না, ঘন ঘন তাঁর খাওয়া বন্ধ হতে আরম্ভ করল। লক্ষ করলাম বিনতার কথায় তির্যক ধার এসেছে। এবং এ ক্ষেত্রে দুজনেই ঠিক, দুজনেই অভ্রান্ত অর্থাৎ দুজনেই দুটি সমান্তরাল রেখা। কাজেই আমি বেঁচে গিয়েছি। আমার যে মামাতো দাদা কালীপুজো করে, পাড়ায় মাস্তানদের নেতৃত্ব দিয়ে, রাজনৈতিক পার্টিদের কাছ থেকে পয়সা খেয়ে, একদা পুলিশের প্রচণ্ড মারে বিধ্বস্ত হয়ে এবং পরে তাদের সাহচর্যে তার সংসার শুধু প্রতিপালনই নয় বেশ তোফা আরামে আছে, তার বাড়িতে মা-র থাকা আমার অপছন্দ ছিল। কিন্তু আমার এই অপছন্দের সঙ্গে সঙ্গে মা-র প্রতি আমার একটা নতুন বিরূপতাও জন্মেছিল। সেকথা সত্যের খাতিরে কবুল করা ছাড়া উপায় নেই। ট্যাক্সিচালকের মেয়েকে তিনি স্বীকার করে নিতে পারেন নি পুত্রবধূরূপে কিন্তু বায়োলজির নোটলেখা বাড়ি হাঁকানো বাপের গুণ্ডা সন্তানের ব্যাপারে তাঁর পীড়াবোধ বিশেষ ছিল না। আমার শ্বশুরমশাই দিশি খান, এবং খেয়ে একটু চেঁচিয়ে গানও গান কিন্তু তিনি পরের ধনে কখনও পোদ্দারি করেন নি। কিন্তু আমার দাদাটির প্রধান আয় কালীমাতা ও নেতাজী উৎসবে জোর জুলুম করে মারোয়াড়ি দোকান-দারদের কাছ থেকে আদায় করা অর্থ। দাদা অবশ্য ঢেকে চেপে কিছুই করেন না। প্রকাশ্যেই বলে বেড়ান, 'ওরা চোর। চুরির টাকায় দুখানার জায়গায় চারখানা গাড়ি করবে, সোনাগাছিতে আরও ঘন ঘন যাবে। তার বদলে যদি একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয় তাহলে কিছু বলবার আছে?'

বিনতা আমাকে চা দিয়ে গেল। বিনতাকে বলেছি আমি রাবার কেমিক্যালের ওপরে একটা রিসার্চ করছি। যদি ঠিকমতো হয় তাহলে

আরও দুশো টাকা মাইনে বেড়ে যাবে। প্রথম প্রথম কারখানা থেকে ফেরার পর আমার কাছ থেকে আর নড়তে চাইত না বিনতা। এখন কিছুক্ষণ পরেই উঠে যায় রান্নাঘরে। নিজেই আমাকে মনে করিয়ে দেয়, 'রিসার্চ করতে বসবে না ?' লিখতে বসলে বাহির থেকে দরজা টেনে দেয়, প্যাঁছে আমার বাচ্চা ছেলের কান্না আমার কানে আসে।

আজ এখনও সন্ধের আলো যায় নি আকাশ থেকে। এই সামনের রাস্তাটা যা গত দুতিন বছরে অনেক কিছু স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের নীরব সাক্ষী, তার শেষে শীলেদের পরিত্যক্ত এবং এখন রেফিউজিদের ব্যবহৃত বিরাট প্রাসাদখানার গায়ে এখনও সূর্যাস্তের আলো চারপাশে ঝোলানো ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়াগুলোতে বাহার এনেছে। তার পাশেই গ্যারাজের গায়ে মোটর গাড়ির বডি মিস্ত্রি তোবড়ানো মাডগার্ড পিটছে। দুটো ন্যাংটো ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ দেখছে। বছর খানেক আগেও ভাবা যেত এসময় এ রাস্তায় লোক চলছে, গাড়ি সারানো হচ্ছে ? আমাদের চারপাশের জগতটা গত কয়েক বছরে হুড়মুড় করে এমন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যে, আমরা যারা তার মধ্যে আছি তারা একেবারেই টের পাচ্ছি না। আমাদের কারখানাটাও আজকাল কিরকম শান্তশিষ্ট, এমনকি খবরের কাগজগুলো যাদের পাতা দিয়ে রক্ত ঝরত সেগুলোও এখন শুধু নারীদের বেশবাস অথবা ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যস্ত। এ বিপুল জলোচ্ছ্বাসের ভেতর আমার এই সাদা একদিস্তা কাগজ আমি একটা ভেলার মতো আঁকড়ে আছি। হয়ত সারাদিনে একবার ঘণ্টাখানেক বসি, কোন কোন দিন তাও হয়ে ওঠে না, মাঝে মাঝে পাঁচ-ছদিনের মতো ছেদ পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব সময় মনের মধ্যে এই একদিস্তা কাগজ, এই রাবার কেমিক্যালের রিসার্চটা, জেগে আছে।

এক একবার ভাবছি আরও খানিকটা সময় গেলে লিখব। এখন তো সংসারযাত্রা চাকরীর বাঁধা রাস্তাটা নিয়ে নিয়েছি। আর কয়েক-বছর পরেই তো ছেলের স্কুলের সমস্যা, তারপর নিশ্চয় নিজের শরীর

আর স্ত্রীর শরীর নিয়ে ভাবনার পর্ব। মাঝখানে মায়ের হাতের পক্ষাঘাতটা যদি সারা শরীরে ছড়ায় তজ্জনিত মৃত্যুতে সাময়িক শোক— অর্থাৎ আমার জীবনের ছকটা তো এখন একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে। আমি তো নিজেকেই নিজে দেখতে পাচ্ছি। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ় আমি ঢুকছি কারখানার গেট দিয়ে। তখন নিশ্চয় এতটা তাড়া থাকবে না। পাঁচ-ছবছর পর থেকেই সেন্ট্রাল অফিসে ট্রান্সফার। মানে সাড়ে দশটায় এখন যেমন সেন্ট্রাল অফিসের বাবুরা হেলতে দুলতে এসে হাজির হন কারখানার গেটে আমিও তেমনি হাজির হব। তারপর রিটায়ার করে লিখতে বসলে হয় না সূর্য ব্যানার্জির কাহিনী, আমার যৌবনের কাহিনী? তখন হয়ত ব্যাপারটা আরও ভাল বোঝা যেত। দূরত্ব, সময়ের ব্যবধান জীবনের যে-কোন ঘটনাকে একটা গোটা চেহারা দেয়। অর্থাৎ যদি একটা ছুটো এক্সটেনশান পাই তাহলে, দু হাজার খৃষ্টাব্দের গোড়ায় সূর্য ব্যানার্জির কাহিনীটা ঠিকভাবে বলা যেতে পারে।

আজকের পরিচ্ছেদটায় চোখ বুলোতে বুলোতে আমি বুঝতে পারছি আমাকে আরও তাড়া করতে হবে, তাতে যদি শেষপর্যন্ত একটা প্রচণ্ড অসংলগ্ন কাহিনীর উদ্ভব হয় তাও ঝুঁকি নিতে হবে, কারণ আমি যা প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম অর্থাৎ আমি লেখক নই, লেখক হবার বাসনা নেই। আমি খালি অকৈতব নিষ্ঠায় আমার এক পরমবন্ধু যাকে আমি ভালবেসেছি, যার প্রতি আমার আকর্ষণের কাছে বিনতা শুধু নয় আমার নবজাতক শিশুর/আকর্ষণও ম্লান, তার প্রতি আমার গভীর কর্তব্যবোধে আমায় লিখে যেতে হবে। যতখানি সম্ভব এরই মধ্যে আমার মেজাজ গুছিয়ে নিতে হবে। কারণ আমার সময় আরও কমে এসেছে। ছেলেটা জন্মাবার পর থেকেই ভুগছে। মাঝে ব্রঙ্কাইটিসে বেশ ঝামেলা ঘোরাল করে তুলেছিল। অর্থাৎ ডাক্তারের ব্যাপারে আমার মা-র জায়গা ছেলে নিয়েছে। তার ওপর বিনতার সঙ্গে অপরিহার্য ঝগড়াটাও কমাতে হবে। অপরিহার্য, কারণ ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ঝগড়া না করলে বিনতার বোধহয় ভাল্ লাগে।

পাঠক নিশ্চয় লক্ষ করেছেন গত পরিচ্ছেদ থেকে এ পরিচ্ছেদে প্রায় আড়াইশো পাতার ব্যবধান আমি আড়াইপাতায় লাফ দিয়ে পার হয়েছি। অর্থাৎ সে রাত্তিরে সোনার বিদায় গ্রহণের পরবর্তী অধ্যায়ে আমি আমার নবজাতক শিশুর ব্রঙ্কাইটিস নিয়ে আলোচনা করছি। এই অসংলগ্নতা সম্পর্কে আমি সহৃদয় পাঠককে প্রথম থেকে সাবধান করে দিয়েছি। আমার মানসিক শৃঙ্খলার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমার সাংস্কৃতিক ব্যাক-গ্রাউণ্ডের যে প্রবল দৈন্য, সে কথাটা তাঁকে বিস্মরণ না হতে অনুরোধ জানাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে একটা প্রশ্নও রাখছি : মানুষ কি মেপে নিঃশ্বাস নেয়, প্রচণ্ড খিদের মুখে সে কি জামাইসুলভ সৌজন্যে আহারে বসে ? যদি এক নিঃশ্বাসে সব কিছু উজাড় করে দিতে পারতাম, এই গত দু-তিন বছরের গরল ও অমৃত যা একসঙ্গে পান করেছি তা উগরে দিতে পারতাম, তাহলেই সার্থক হবে আমার ব্রত। সিনেমায় যে মণ্টাজ-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেই পদ্ধতি গ্রহণ করতে আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে। যেমন দেখুন, কলকাতার ট্রামজোড়া সরকারী বিজ্ঞাপন—'হিংস্রতা বর্জন করুন' এবং 'নিষ্প্রদীপ মহড়া পালন করুন'। দুটো ট্রাম দুরকম আবেদন গায়ে এঁটে পরপর চলেছে। এ দুটো যেন সম্পূর্ণ দুটো জগত। এই দুটো বিজ্ঞাপনই এমন চমৎকার নাটকীয়ভাবে আমাদের কালের ইতিহাসটা এক ঝটকায় উপস্থিত করে, এমন প্রকাণ্ড উল্লম্ফনে দু-তিনটে বছর এগিয়ে নিয়ে যায়, পেছনে চলে যায় যে, আমারও হাত নিশপিশ করে এইরকম কতগুলো একঝটকায় উপস্থিত হওয়া সত্যকে পাঠকের চোখের সামনে মেলে ধরতে। অথচ 'কোন জিনিষ মশাই আউটলাইনেই ধরবেন না, তাতেই যদি তৃপ্ত থাকেন তাহলে ঠকবেন,' সূর্য ব্যানার্জির এই কথাটা ঠিক এখনও ঘণ্টার মতো আমার বুকের মধ্যে বেজে ওঠে। হিংস্রতা বর্জন করুন, খুব সত্যি কথা কিন্তু যে নীরব প্রকাণ্ড সর্বগ্রাসী হিংস্রতার ওপর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তার সামনে কিভাবে দাঁড়াবেন ? কিভাবে মানুষের প্রয়োজনের চাহিদার পণ্য সৃষ্টির বদলে নেহাত মুনাফার লালসায় পণ্যসৃষ্টির জগতকে বানচাল

করবেন? সূর্যর প্রশ্ন এইখানে, আর সে প্রশ্নের গুরুত্ব অসামান্য।

সূর্য আমাকে বলত সাহিত্যের কথা। আমি তখন ঠিক বুঝতাম না, বাস্তবিক তলে তলে আমার রাগও হোত। সমস্ত ব্যাপারটা হেঁয়ালী করে দেখবার প্রবণতা যেন তার মধ্যে লক্ষ করতাম। এখন এগুলো আর হেঁয়ালী ঠেকে না। সূর্য বলত, 'সাহিত্যে কোন কিছু গড়ে তোলা অনেকটা মায়ের সন্তানপালনের মতো, ধীরে ধীরে তাকে লালন করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ঔপন্যাসিকরা যেমন করত। ফিল্মে মণ্টাজ পদ্ধতি খুব চমকপ্রদ। কিন্তু বাস্তবের চেহারা তলিয়ে বুঝতে আমাদের গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত সমস্ত ধাপগুলো পেরিয়ে যেতে হবে। এখন তো গ্রামে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় যে কৃষি-বিপ্লবের চেহারা এবং সত্যিসত্যি গ্রাম এবং চাষীর যে চেহারা, তার মাঝখানে তো আসমান-জমিন ফারাক। যেমন ধরুন, আমার একটা ধারণা জন্মেছে—যেরকম ধারণা আগে অসম্ভব লাগত—চাষীর হাতে যদি আর একটু পয়সা থাকত, অর্থাৎ সামান্য স্বাচ্ছল্যবোধ থাকত, তাহলে কৃষিবিপ্লব ত্বরান্বিত হোত।'

'আপনি যে একেবারে উল্টোপাল্টা কথা বলছেন মশাই।'

সোনা হেসে বললে, 'আমি যেদিন ওদের সঙ্গে সারাদিন হাল দিই সেদিন বুঝতে পারি। সেদিন বুঝতে পারি মাজাভাঙা অবসাদে ওরা কেন সন্ধেবেলা ধুঁকতে থাকে আর খাওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডেকে। লেখাপড়ার কথা ছেড়ে দিন, সামান্য একটু ভাববার সময় নেই, বিশেষ করে চাষের সময়। কেমন একটা তাড়া-খাওয়া জানোয়ারের মতো জীবনযাত্রা। তার মধ্যে আপনি এসেছেন কৃষিবিপ্লবের ঝাণ্ডা হাতে। সবসময় সজাগ—বিপ্লবের কথাটা কিভাবে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু কোন ফুরসুৎ আসছে না। অপরিসীম দারিদ্র এ মানুষগুলোকে একেবারে চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে। যদি বলেন, আরও দুবিঘে জমি দেব মাথা পিছু, তাহলে হয়ত আপনার কথাটা কিছু পরিমাণে পৌঁছবে। কিন্তু কৃষিবিপ্লব মানে তো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কারের মতো কিছু পাইয়ে দেওয়া

নয়, সমস্ত গ্রামের চেহারাটা পাল্টে ক্ষমতা দখলের দিকে এগোনো, তার জন্যে অকুতোভয়ে সমস্ত পথের কাঁটাগুলো উপড়ে ফেলা—এরকম ব্যাপারটা এই অপরিসীম দৈন্য আর আহারের ধান্দায় মালুম হয় না।'

এটুকু বলে আমি আবার ব্যাক্ করি। ব্যাক করি ত্ব'বছর আগে উনসত্তর সালের এক শনিবারের ত্বপুরে আমাদের অঞ্চলের এক গোপন মিটিংয়ে। এখানে আমার উপস্থিতি প্রায় অনর্থক, কিঞ্চিৎ বিপজ্জনকও। কারণ সোনা এবং তার তুই ভাই বাদ দিয়ে এই বারো-চোদ্দজন তরুণ ও বালক আমার কাছে সবাই অচেনা। আমাদের জেলার একজন মেধাবী ছাত্র যাদবপুরের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের তপেশ, চা-ওয়ালা মানিক দাস ছাড়াও তিনটি চমৎকার সুঠাম তরুণকে দেখে আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ছিলাম। আমাদের কাছে বলা হয় নি, পরে জানতে পেরেছিলাম, তুটি তরুণের পেছনে মার্ডার কেস ইতি-মধ্যেই ঝুলছিল। এ মার্ডার অবশ্য রাজনৈতিক কারণে নয়।

'আরু' মানে আরুণি উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। ক্লাস নাইনের ছেলে। তার তীক্ষ্ণ সুরেলা গলায় আরু চেঁচিয়ে উঠল, 'সমস্ত দেশ শ্রেণীঘৃণায় জ্বলছে আর আমরা কী করছি? আমাদের জেলা সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়ে আছে।' একবার দাদার দিকে বাঁকাভাবে তাকিয়ে বললে, 'এটা আমাদের নেতৃত্বের দোষ। আমাদের জেলার নেতারা আসলে কাওয়ার্ড। সেইজন্যেই কাগুজে বাঘগুলো দিনরাত তড়পে বেড়াচ্ছে। আমাদের আজ ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এই সব শ্রেণী শত্রুদের বিরুদ্ধে। আমাদের পার্টির নির্দেশও তো শ্রেণীশত্রু খতম কর। এই লিস্টে যেমন জোতদার আছে তেমনি আছে সেই সব মানুষ যারা আমাদের বিপ্লবের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব নয়া শোধন-বাদীদের খতম করার অভিযানে সামিল হতে হবে। শ্বেত সন্ত্রাসকে স্তব্ধ করো লাল সন্ত্রাস দিয়ে—আমাদের পার্টির এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।'

গত বছর পাড়ার ক্রিকেট ম্যাচে আরুর সর্বোচ্চ রানসংখ্যা একচল্লিশ

তুলেছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমিও তার মারের তারিফ করেছিলাম। গত এক বছরে সে যে এত পাল্টে গেছে স্বপ্নেও ভাবিনি।

উপমন্যুর ডাক নাম ছিল উপি। উপমন্যু তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান। তার পেশীস্বচ্ছল চেহারা, হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে সে বর্তমান জেলার নেতৃত্ব, বিশেষ করে তার দাদাকে প্রবল আক্রমণ করলে। আরুর চেয়ে সে এক বছরের বড়। বিপ্লব যে সূচীকর্ম নয়, মাও সে তুংয়ের সেই বিখ্যাত বক্তব্য আগাগোড়া কোট করলে। তার বক্তব্য তার ভাইয়ের থেকে আরও চড়া। শ্রেণীঘৃণায় সমস্ত ভারতবর্ষ ফেটে পড়ছে হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত। এই ব্যাপারটাই জেলার নেতারা ধরতে পারছে না। সুতরাং হাতে যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। চীনদেশের সঙ্গে উপমাও দিলে। গেরিলা যুদ্ধের সময় চীনা-গেরিলাদের হাতে সামান্যই অস্ত্র ছিল কিন্তু তাতেও বিপ্লব আটকে থাকে নি। তারও প্রবল আক্রোশ নয়া শোধনবাদীদের ওপর। এ জেলায় একটাও নয়া শোধনবাদী খতম হয় নি। বুক বাজিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সূর্য গম্ভীরভাবে বললে, 'আমাদের মূল লক্ষ্য কৃষিবিপ্লব। কৃষিবিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্যে আমাদের যা যা করণীয় সমস্ত কিছু করতে হবে। কিন্তু কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না। মধ্যবিত্ত রোমান্টিসিজম আর শ্রেণীঘৃণা এক নয়।'

এতক্ষণ এক বয়স্ক ভদ্রলোক চুপ করে শুনছিলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, 'এইসব চুলচেরা বিশ্লেষণ তোমার কাছ থেকে শুনতে আমরা আসি নি সূর্য। মধ্যবিত্ত রোমান্টিকরাই আজ সবচেয়ে রোমান্টিসিজমের ধুয়ো তুলছে। তোমার জেলায় তুমি ফতোয়া দিয়েছো, অন্য পার্টির লোকের গায়ে হাত তুলো না। আমি তোমাকে প্রশ্ন করি, যদি কার্যত অন্যপার্টির কোন লোক পুলিশের দালালী করে...'

'সেরকম ক্ষেত্রে আমি নিশ্চয় নির্দেশ দিই নি।' সূর্য সতর্কভাবে জবাব দিলে।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা এখানে যারা সমবেত হয়েছি তারা কি সবাই সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ? কারণ আমি খোলাখুলি জানাচ্ছি এ পথ শোধনবাদের পথ নয়। বিপ্লবের নামাবলী গায়ে দিয়ে এই সমাজব্যবস্থা কায়েম করার পার্টি আমাদের নয়। আমাদের যারা হঠকারী বলে বর্ণনা করছে তাদের একটা প্রশ্ন করি, গত বাইশ-তেইশ বছর কি আপনারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছেন, এত মিটিং মিছিল আবেদন অ্যাসেমব্লিতে এত গলাকাঁপানো যা করতে পারে নি, আমাদের সামান্য কয়েকমাসের খতম অভিযান তাই করেছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটা যদি চোখের সামনে থাকে তাহলে আমরা আর চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্যে যাব না।'

সূর্য আগ্রহের সঙ্গে বললে, 'কমরেড যা বললেন তা সর্বাংশে সত্য। কিন্তু সেইজন্যেই আমাদের ওপর আরও বেশি দায়িত্ব বর্তায়। আমাদের অভিযান এমনভাবে চালাতে হবে যাতে আমরা মেহনতী মানুষের নেতা হিসেবে থাকতে পারি। যেন আমরা আমাদের মহান নেতার আদেশ অনুযায়ী জলের মধ্যে মাছের মতো থাকতে পারি।'

'তার মানে জলের তলায় কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে পালিয়ে থাকা নয়', বয়স্ক ভদ্রলোকটি বললেন।

'আমি কখনই তা বলছি না। আমার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার আছে সেইজন্যে আমার দায়িত্ব ঠিক শত্রু চিনে আঘাত করা।'

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, 'সূর্য, আমি এ মিটিংয়ের আগেও বলেছি, চুলচেরা বিশ্লেষণ করার সময় এ নয়। তোমার কথাই আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মেনে নিলেও এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে, আমাদের আঘাতে হয়ত কিছু নিরপরাধ লোকও প্রাণ হারাবে। প্রত্যেক দেশের বিপ্লবের ইতিহাসই তাই বলে। কিন্তু আমরা সেই নেতৃত্বকেই সুবিধেবাদী শোধনবাদী বলি যারা বিপ্লবের দুর্গম রাস্তা স্মরণ করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত। শেষপর্যন্ত তারাই সবচেয়ে প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়।'

বুঝতেই পারলাম ভদ্রলোক এ অঞ্চলের নেতৃত্ব পরিচালনা করবার

জন্যে এসেছেন। আলাপের ধারা যেদিকে চলেছে তাতে আমার একটা ভয় হতে থাকে, সূর্য যেন কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে। তার বক্তব্য সে যথেষ্ট গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করলেও সে তার নিজের ভাইদের কাছেই ঠিক পৌঁছতে পারছে না। বলতে কি, এ অঞ্চলে সূর্যের নেতৃত্ব যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা আভাস সে মিটিংএ পেয়েছিলাম।

ভদ্রলোক এবার আমাদের সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনাদের আগেই ভেবে দেখতে বলছি। কিছুদিন পরে যেন ফ্যামিলির কথা, মায়ের কথা, স্ত্রীর কথা, বৃদ্ধ বাপের কথা আমাদের শুনতে না হয়। এ সমস্যা চিরকালের। এসব কথা আমাদের ক্ষেত্রে একেবারেই খাটবে না। আমরা যারা অগ্রসর হব, যারা আমাদের শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘটনা আমাদের দেশের মাটিতে ঘটাবার দায়িত্ব নেব, তাদের কোন পিছটান থাকলে চলবে না। আমাদের ত্যাগে আমাদের জাগাতে হবে আর সবাইকে। সুতরাং মৃত্যু আমাদের পক্ষে অনিবার্য।'

আরু কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'আমরা তৈরী। কোনকিছুই আমাদের পিছুটান হয়ে দাঁড়াবে না।' কচি বাঁশগাছের মতো তার শরীরটা দুলতে থাকে।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারটির দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের সবাইকে আমরা ভেবে দেখতে বলছি।'

স্বাস্থ্যবান দীর্ঘকায় ফর্সা যুবকটির মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'এগুলো আমরা ভেবেই এসেছি। আর সবকিছু ছাড়তে হবে।'

'আপনি তো নতুন বিয়ে করেছেন?'

'তাতে কী! আমি ভেবে দেখেছি। চাকরি করে আমার পক্ষে পার্টি করা যাবে না। ওগুলো ছাড়তেই হবে। এতবড় একটা ঘটনা ঘটছে। যদি পিছিয়ে পড়ি নিজের কাছেই ছোট হয়ে পড়ব। আরু পারে, আমি পারব না?'

ইঞ্জিনিয়ারটির শেষ কথা আমি পরে ভেবেছিলাম। পরে, মানে বেশ পরে, যখন ঘটনার গতি ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হয়েছিল। তখন মনে

হয়েছিল জবাবটা,—আরু পারে কারণ আরুর হারাবার কিছুই নেই। পৃথিবীর শব্দ স্পর্শ গন্ধ তার কাছে অনুপস্থিত, তাই পৃথিবীতে বাস ও পৃথিবী থেকে বিদায় প্রায় সমার্থক তার কাছে।

কিন্তু সেদিন বোধহয় সেই কচিবাঁশের সতেজ চিকণ চেহারা আমাকেও প্রভাবিত করেছিল। কারণ ভদ্রলোক তারপরেই আমার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বললেন, আপনি?' সঙ্গে সঙ্গে আমি জবাব দিলাম, 'আমি প্রস্তুত।'

এবং সঙ্গে সঙ্গে সূর্য ধমকের স্বরে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'না না, উনি প্রস্তুত হতে যাবেন কেন? উনি আমাদের একজন সমর্থক, কিন্তু তার বেশী নন, এখন ওঁর কাছ থেকে বেশী আশা করা ভুল হবে।'

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ওঁকেই বলতে দাও না সূর্য।'

'আমি ওঁর সম্পর্কে পরে আপনাকে বলব।' সূর্য বললে।

'তাহলে ওঁকে এনেছ কেন?' বেজারভাবে ভদ্রলোক বললেন।

সূর্য দৃঢ়ভাবে বললে, 'সবাই তো আর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। আরও সময় যাক। মানিক, তুমি বলো।'

মানিকও তার মানসিক প্রস্তুতির কথা জানালে। অবশ্য স্থির হোল, তার চায়ের দোকানটা একটা ডেরা ভাবে ব্যবহৃত হবে এবং আপাত-দৃষ্টিতে পার্টির অন্যান্য লোকের সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখবে না।

মিটিং যখন ভাঙল তখন আমার বন্ধু ও নেতা সম্পর্কে আমার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। রাস্তায় নামতেই সূর্য বললে, 'যখন আপনার দরকার হবে, আপনাকে জানাব।'

৭

তিন-চার দিন পর দুপুরবেলা ল্যাবরেটরীতে পলিথিন সীট টেস্ট করছি এমন সময় বেয়ারা এসে জানালে সাহেব সেলাম দিয়েছে।

আমি সুইচ বন্ধ করে পোচখানেওয়ালার ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবি, আজ বোধহয় নারীচরিত্র সম্পর্কে সাহেব জ্ঞান দান করবেন। এই সময়টা কাজ হাল্কা। এখন মাঝে মাঝে গল্প করতে আমায় ডাকেন। বিষয়বস্তু নরনারীর মনোমালিন্য এবং বেশীর ভাগ নারী কেন ন্যাগিং টাইপ হয়, অথবা পশ্চিমবাংলার রাজনীতি, ভায়লেন্স যদি চলে তাহলে কারখানা চলবে কী করে ইত্যাদি। ভদ্রলোক চমৎকার বাংলা বলেন সুরেলা গলায় আর স্বগতোক্তি করতে ভালবাসেন। আমাকে ডাকেন কারণ প্রায়শ আমি নীরব শ্রোতা।

ঘরে ঢুকেই দেখি ভদ্রলোকের মুখ খুব উত্তেজিত। 'হোয়াট ইজ দিস মিত্র?' বলে একটা সাদা কাগজ আমার দিকে ঠেলে দিলেন। কাগজটায় স্বাক্ষরকারী সূর্য ব্যানার্জি। ইংরেজীতে টাইপ করা তিনটে লাইন। সূর্য জানাচ্ছে যে সে চাকরীতে ইস্তফা দিচ্ছে এবং তার পাওনা যেন তার মা-র ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

'হোয়াট ইজ দিস্?' তার সরু ছুঁচলো ফর্সা মুখখানা কাঁধ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়।

'আমি কী জানি। আমি রিজাইন করলে জবাবদিহি করতাম।'

'হ্যাজ হি গন্ ম্যাড?'

'আস্ক হিম্।'

'আমাকে রমেন বললে সে আপনার পার্সোনাল বন্ধু তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আমার সঙ্গে পরামর্শ করে তো কিছু করে নি। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোন কথাবার্তাই হয় নি।'

'আপনি তাকে বলুন রিকন্সিডার করতে। আর কেউ হলে বলতাম

না। বাট স্ূর্য ইজ এ ব্রিলিয়াণ্ট বয়।'

আমি একটু সাবধানে বললাম, 'ওর সঙ্গে আজকাল আমার দেখা হয় না।'

'আই সি। তবে আপনার কি মনে হয় এটা তার পলিটিকাল ডিসিশ্যান?'

আমি আবার সতর্কতার প্রয়োজন বোধ করি। বললাম, 'আমি তো আপনাকে বলছি, এ সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার কোনদিন আলাপ হয়নি।'

'আপনি আমাকে ট্রাস্ট করছেন না মিত্তির?'

আমি আবার বিরক্ত বোধ করি। সবচেয়ে বেশী বিরক্ত হই রমেনের ওপর আমাকে স্ূর্যর সঙ্গে জড়ানোর জন্যে।

'ট্রাস্টের কোন কথা নয় মিষ্টার পোচখানেওয়ালা। আমি যা জানিনা তা জানি বলতে হবে আমাকে?'

ভদ্রলোক বেজারভাবে বললেন, 'ছেলেটার ভালর জন্যে বলেছিলাম। থাকলে রাইজ করত।'

সেদিন ছুটিব আগেই খবরটা আমাদের কারখানার এক বর্গমাইলের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল গেটম্যান থেকে আরম্ভ করে সীনিয়র অফিসার পর্যন্ত। ছুটির পর সেনট্রাল ল্যাবরেটরী আর ক্লোরিন প্লাণ্টের সামনে এক-একটা ছোট ছোট জটলা।

রমেন হঠাৎ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'স্ূর্য কি আণ্ডারগ্রাউণ্ড গিয়েছে?'

'জানি না, আমি কী করে জানব?'

'বলুন, আমরা সেইরকম ব্যবস্থা করব।'

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যবস্থা করবেন?'

'আমরা কালই পোস্টার দেব পুলিশকে হুঁশিয়ার করে।'

'সে আপনারা যা ইচ্ছে করুন।'

বাড়ি ফিরেই দেখি সোনা বসে আছে। আমাকে ডেকে বললে,

'আমি হয়ত এ অঞ্চল থেকে চলে যাব শিগগিরই।'

'গ্রামে যাচ্ছেন?'

'ঐখানেই তো আসল কাজ। এতদিন যা ভেবে আসছি তা কাজে লাগাতে হবে। মনে হচ্ছে এই প্রথম রাজনীতি করতে যাচ্ছি।'

'গাঁয়ে তো আগেও শহরের মানুষ গিয়েছে।'

'গিয়েছে আসলে বক্তৃতা দেবার জন্যে। আমি যাচ্ছি সেখানকার লোকজনদের মধ্যে একেবারে মিশে যাব বলে। তাহলেই আমরা যে কৃষিবিপ্লবের কথা বলছি তার কোন মানে হয়।'

আমার মনে ইতিমধ্যেই তার নতুন পার্টি সম্পর্কে কতকগুলো প্রশ্ন জাগছিল, কিন্তু মনে হল একটা চাপা উত্তেজনায় সে ঝলমল করছে। 'আমার খবর আপনি মানিক দাসের কাছে পাবেন। আমার ভাইরা আমার খবর জানবে না।'

আমি সোনাকে কোন প্রশ্ন করি না কারণ তার বিচারবুদ্ধিকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। সে যখন ঝাঁপ দিয়েছে তখন নিশ্চয় সব বুঝেই দিয়েছে।

'মায়ের বোধহয়. একটু অসুবিধে হবে। বাবার সঙ্গে তো কোন যোগাযোগ নেই। আর উপিও বাড়ি ছেড়েছে। আমি অবশ্য মাকে বুঝিয়েছি। মা-ও বোঝেন, কিছু লোককে সবকিছু ছাড়তেই হবে। তাছাড়া কোন উপায় নেই।'

আমি খুব সাবধানে বললাম, 'তাহলে কিভাবে চলবে?'

'অফিস থেকে কিছু টাকা পাব। সেটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে দেবেন। যা ইন্টারেস্ট আসে। আর মা তো সেলাইয়ের টিচার। অবশ্য মাসকয়েক কী গণ্ডগোল চলছে, মাইনে পাচ্ছেন না। তবে এসব অসুবিধা সাময়িক। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।'

আমি চুপ করে থাকি। 'আমার সম্পর্কে আপনাকে নিশ্চয় অনেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আপনি পরিষ্কার জানিয়ে দেবেন, আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললে, 'সেদিনের মিটিং কেমন লাগল ?'

'আরুকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছিল।'

সোনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'ওরা খুবই সীনসিয়ার টাইপ। কিন্তু আর একটু ভাবনা-চিন্তা করলে বোধহয় ভাল হোত। কি জানি! ঘটনার গতি খুব দ্রুত এগোচ্ছে। এত দ্রুত এগোচ্ছে যাতে অনেক সময় মনে হচ্ছে ঠিক ধরতে পারছি না। তবে এটা নিশ্চিত, সব কিছু ওলোট পালোট হয়ে যাবে। আমরা এমন একটা বিপ্লব করতে যাচ্ছি যেরকম আগে কখনও ঘটেনি আমাদের দেশে। সবকিছু নিয়ে আমাদের বিপ্লব, আমাদের ভাবনা চিন্তা কাজ, আমাদের গোটা অস্তিত্ব নিয়ে। অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তার খতিয়ান করবার সময় এখন নয়। যে খতিয়ান করবে সে ভুল করবে।'

এর কিছুদিন পরেই আমাদের অঞ্চলের সমস্ত ঘর বাড়ি পাঁচিল আলসে দেয়ালে মাও সে তুং লেনিনের বাণী আলকাতরার আঁচড়ে প্রকাশিত হয়। কয়েকটা একতলা বাড়ির গায়ে এক চিলতে ফাঁক ছিল না। এমন কি গঙ্গার ঘাটে হরিসভার দেয়ালেও লেখা হল, 'সেদিন আর বেশী দূরে নেই যখন বড়লোকের পিঠের চামড়ায় গরীবের জুতো তৈরী হবে।' সেই দেয়ালের গায়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বিধবারা হাতজোড় হয়ে কৃষ্ণকীর্তন শুনতেন। ঘুম ভেঙে গেলে মাঝরাতে উঠোন পেরিয়ে বাথরুম যেতে গিয়ে দেখেছি আরু উপি আরও কয়েকটি তরুণকে, আলকাতরার টিন ও তুলি হাতে ঘোরাফেরা করতে।

এই সময়ই আমার বিনতার সঙ্গে আলাপ। বিনতার বাবা কান্তি-বাবু গাড়ি গ্যারাজ করে বাজারের দোকান থেকে দিশী খেয়ে ফিরছিলেন রিক্সা চেপে। বেশ রসস্থ হয়ে কৈজ খাঁর 'বন্দে নন্দকুমার' ভাঁজছিলেন এবং রিক্সাচালকের অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই উঠবেন না। প্রকাণ্ড ভিড় ঠেলাঠেলি। আমাদের জনতা স্টোভে কেরোসিন ছিল না। আমি এক বোতল কেরোসিন কিনে ফিরছিলাম রিক্সার পেছনে পেছনেই এবং আজকাল উত্তেজনা চারপাশে এত বেড়ে উঠেছে যে ভিড়টা লক্ষ্য করেই

বাড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম, আমার পথরোধ করল বিনতা। মেয়েটাকে আগেও দেখেছি, মাস দু'তিন হল পাশের বাড়িতে এসেছে।

'বাবাকে ওরা মেরে ফেলবে। আপনি একটু নিয়ে আসবেন?' জন্তুর মতো তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ দুটো আমাকে আকৃষ্ট করে।

'আপনার বাবা?'

'ওঁর শরীরটা খারাপ কি না, একটু দেখবেন?'

আমি খুব উৎসাহবোধ করি না। তবে অযথা মাতাল পেটানো প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

ভিড়ের মধ্যে দু'তিনটে ছেলেকে চিনতে পারি, আরুর সঙ্গে এক-জনকে দেখেওছি।

'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। কী সব ঝামেলা বাড়াচ্ছো?'

ছেলেরা বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করলে না। প্রথমত পাড়ায় আমি প্রায় অপরিচিত এবং আমার আকৃতি খুব একটা সমীহ করার মতো নয়।

আমি আরুর সেই বন্ধুটির দিকে চেয়ে বললাম, 'হার্ট কেস্ ভাই, ছেড়ে দাও। মারধোর দিলে আবার মরে যাবে। মিছিমিছি ঝামেলা করে কী লাভ?'

ছেলেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সরে গেল। বিনতার বাবা একটি বিশাল লাশ। আমি আর রিক্সাওয়ালা ধরাধরি করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলাম। ভদ্রলোক তখনও আমার ঘাড় জড়িয়ে 'বন্দে নন্দকুমার' -এর তান বিস্তার করছেন।

'আপনি একটু চা খেয়ে যান।'

এমন একটা কাকুতি ছিল মেয়েটার গলায় যে আমি না করি না। ঘরে কাঁচা-পয়সার ছাপ আছে। রেকর্ডপ্লেয়ার, রেকর্ড, কতগুলো শূন্য রামের বোতল, রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা, আবার রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'।

'বাবার একটু গানবাজনার সখ আছে', মেয়েটা আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলে। একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, 'মীর্জাপুর স্ট্রীটে আমাদের হোটেল ছিল। বন্ধুদের ধারে খাইয়ে হোটেল তুলে দিলেন।'

'মা ?'

'মা নেই, ছেলেবেলা থেকেই আমি একলা। বাবা আর আমি।'

'ভাই ?'

'একটা ভাই ছিল। পল্লে…'

'ও।'

চা এলে আমি নিঃশব্দে চা পান করি। বিনতার বাবা চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছেন। বেশ নাক ডাকছে।

মাথা নীচু করে শাড়ীর আঁচল পাকাতে পাকাতে মেয়েটি বললে, 'ঐ যে অমিয় নস্কর মিনিস্টার ছিল, ওর স্ত্রী আমার মাসীমা।'

অকস্মাৎ একটা হাসির দমক উঠে আসে আমার গলায়।

মেয়েটি আবার বললে, 'বালীগঞ্জ গার্ডেনসে নতুন বাড়ি করেছেন। জানেন না ?'

আমি মেয়েটাকে দেখতে থাকি। ছিমছাম শ্যামলা চেহারা, হেসে ফেলি।

'হাসছেন কেন ?'

আমার মুখে এসেছিল আমার এক দূর সম্পর্কের পিসীমা কোন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের স্ত্রী কিন্তু সামলে নিলাম। এমন কি বেশ মমতাবোধ করি তার দিকে চেয়ে।

'আপনি খুব ভোরে বেরিয়ে যান ফ্যাক্টরীর কাজে—না ?'

'আপনি তো অনেক খবরই রাখেন দেখছি।'

'আপনার বাড়িতেও মা ছাড়া আর কেউ নেই, না ?'

আমার মুখে এসেছিল 'আপনার মতো' কিন্তু আমি বলতে পারি না। বলতে কি মেয়েদের সঙ্গে সংলাপে আমি বিশেষ অভ্যস্ত নেই। সেই সব কথাবার্তা যার ছদ্মবেশে হৃদয়ের আদান প্রদান সহজেই ঘটে যায়, সেই ধরনের সংলাপে আমার একেবারে রুচি নেই। আমি শুধু এক একবার ঘুমন্ত ভদ্রলোকটিকে এবং তার মেয়েটিকে দেখতে থাকি।

'কী দেখছেন ?'

'তোমাকে।' দ্বিধাহীনভাবে বলি। কোন লুকোচুরি ভাল লাগে না।

'আপনি না এলে আজ যে কী মুস্কিলেই পড়তাম।'

আবার সেই হৃদয় আদান প্রদানের সংলাপ শুরু হোল। দরজার কাছে কেরোসিন ভর্তি শিশিটা চোখে পড়ে।

'সন্ধেবেলা কী কর?'

'কী করব? রান্না করি। বাবা এলে খেতে দিই।'

'কাল সন্ধেবেলা আমি আসব।'

মেয়েটি উৎসাহে মাথা নাড়িয়ে বললে, 'আসবেন, আসবেন।'

'বাবা সন্ধে সাতটাতেই ফিরে আসেন।'

আমি মেয়েটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলি, 'যদি তার আগেই আসি?'

মেয়েটিও আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বোধহয় আমার কথাটা মাপতে চেষ্টা করে। তারপর তার সেই টান্‌টান্‌ ভাবটা কেটে যায়। হেসে বলে, 'আসুন না।'

আমি পরেও ভাবতে চেষ্টা করেছি। পড়শী নিয়ে যে প্রেমকাহিনী সিনেমার গল্পে সচরাচর দেখা যায়, আমি কেন সেইরকম কাহিনীর নায়ক হবার জন্যে উৎসাহ বোধ করলাম? মেয়েটি যে অর্থে সুন্দরী তা কেবল সোনার কাছ থেকে পাওয়া মাইকেল মধুসূদনের নাটকের লাইনের অর্থেই, অর্থাৎ যৌবনে কুক্কুরীও সুন্দরী এবং সে যে একেবারে আমার কক্ষপথ থেকে আলাদা তা তার মাসীমার প্রসঙ্গেই যথেষ্ট স্পষ্ট। কিন্তু একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে, মেয়েছেলে প্রসঙ্গে আমি বোধহয় আমার বন্ধু ও নেতা থেকে আলাদা। সোনা বরাবরই নির্যাতিত নারী সমাজের এক ছবি আমার সামনে রেখেছে, মেয়েরা সব দিক থেকে কোণঠাসা এবং তাদের সুকুমার বৃত্তি আমাদের থেকে অনেক জোরাল, তাদের মমত্ববোধ, তাদের ধৈর্য, তাদের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, তাদের আরও উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে। মেয়েদের সম্পর্কে তার এই কবিতার

মেজাজ বরাবর লক্ষ করেছি। আমি অবশ্য আমার বাবা ও মা-র সম্পর্কে সোনার কথার সত্যতাই টের পেতাম। এবং মায়ের সঙ্গে সেইজন্যে এক গভীর সখ্যও বোধ করতাম। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে আমার ও আমার মায়ের যে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পর্ক, তার ছেদ পড়ার প্রয়োজনীয়তা টের পাচ্ছিলাম। আমরা ক্রমশ এমন পর্যায়ে পৌঁছচ্ছিলাম যে আমাদের আর কোন চাহিদা নেই। মা প্রায়ই তাঁর নিজের অতীতের কথা বলতেন, যদি কম বয়সে বিবাহিত জীবনের নরকে প্রবেশ না করতেন তাহলে তাঁর জীবনটা অনেক তাৎপর্যপূর্ণ হোত—এরকম কথা শুনতে শুনতে আমি প্রায় এটা এক সার্বিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলাম। মাঝে মাঝে খোলাখুলি বলতেনও, 'তোদের এখন বয়স কম গোনু। বিয়ে-থা করিস নি, এখন যেসব ভাবনাচিন্তা করিস তার মধ্যে একটা শুদ্ধতা আছে, কোন প্যাঁচ নেই। বিয়ে করলেই প্যাঁচ আসবে। সত্যিই বিয়েটা দিল্লীকা লাড্ডু।'

আমি কখনও প্রকাশ্যে মায়ের কথায় প্রতিবাদ করি নি কিন্তু মনে মনে প্রতিবাদ জমা হতে থেকেছে। মা যেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার প্রকাণ্ড গুরুভার আমার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। এই নির্ঝঞ্ঝাট ক্লান্তিকর প্রাত্যহিক রুটিনটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে আরও সরব মুখর উত্তেজনাপূর্ণ, হয়ত কিছুটা অর্থহীন, কিন্তু আরও জীবন্ত জীবনযাত্রার দিকে হাত বাড়াবার জন্যে আমার মন ভেতরে ভেতরে ছটফটিয়েছে। আমি জানতাম, যে সরল যুক্তিতে আমাদের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা সচরাচর বিয়ে করে যেমন—কতদিন মেসে খেয়ে খেয়ে পেটের গণ্ডগোলে ভুগব—সে যুক্তি আমার ক্ষেত্রে টেঁকে না। আমার মা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আমার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে এসেছেন। কিন্তু তাঁর এই দক্ষতাই এখন আমাকে বিদ্রূপ করে। বস্তুত আমার যেন আর কিছুই করার নেই, ভোরবেলা উঠে দাড়ি কামিয়ে কারখানায় দৌড় দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে তাঁর সঙ্গে খেতে বসে দীর্ঘ গল্প করা ছাড়া। তাঁর বাল্যকাল, তাঁর রবিঠাকুরের কবিতা মুখস্থ করার কাহিনী,

বিয়ের পর হুয়েকটা দামাল বছর যেতে না যেতেই স্বপ্নভঙ্গ। এসব গল্প আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মা বলতে সুরু করলেই আমি বলতাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই, ছোট সে তরী', আমারও মুখস্থ ছিল। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আমার এলার্জি ধরে গিয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত রেডিওতে শুরু করলেই মা ঘরে আলো নিভিয়ে চোখ বুঁজে শুনবেন। আমি মাঝে মাঝে ভিন্ন স্বাদের জন্যে আধুনিক গান খুলতাম কিন্তু একটুক্ষণ পরেই এমন ন্যাকার-ন্যাকার লাগত যে বন্ধ করে দিতাম। আমি ভাবতাম, এরকম গান বাংলায় হয় না, যা রবীন্দ্রনাথের মতো মন উদাস করে না, কিংবা আধুনিক গানের ন্যাকামোতে বমি পাইয়ে দেয় না, অথচ যা আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ জাগায়, মজা লাগে, ফুর্তি লাগে, উষ্ণতা আনে, এরকম গান নেই? আমি ক্লাসিকাল গানও চেষ্টা করেছিলাম। কতগুলো রাগ আমার ভাল লাগত যাতে কোমল স্বরের প্রাধান্য। এইসব ভোরের সুর, ভৈঁরো ভৈরবী ললিত-এর আলাপ আমার খুব ভাল লাগত। কিন্তু বোধহয় শিক্ষার অভাবের দরুণই পরবর্তী পর্যায়ে তান বিস্তারে আমি অসহিষ্ণুতাবোধ করতাম। আমার মায়ের আবার ক্লাসিকাল ভাল লাগত না। তাঁর বাউল কীর্তনধর্মী রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ। 'তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে', এ গানটা বারেবারে রেকর্ডে বাজাতেন। আমার কান পচে যাবার জোগাড়। বলতে কি, আমার এই একলা চলার সঙ্গীত ভাল লাগছিল না। সোনার একটা কথা আমার কানে আমার বুকের মধ্যে গমগম করে বাজত, এখনও বাজে—কমিউনিজম একটা উৎসবের মতো, সবাইয়ের ডাক পড়েছে সেখানে। সোনার মেজাজে এমন একটা জিনিষ ছিল, যা আমাদের বিরাট কারখানার সর্বস্তরের মানুষের মনে সাড়া জাগাত। সবাইকে অন্যভাবে ভাবতে সাহায্য করত। তার হঠাৎ ফুৎকারে উবে যাওয়ায় আমি দমে গিয়েছিলাম। আমি বোধহয় মনের দিক থেকে এ অবস্থা মেনে নিতে পারি নি।

তাছাড়া সোনার সঙ্গে আমি যে সম্পর্ক অনুভব করতাম তা ঠিক

সহকর্মীর রাজনৈতিক কোন অভ্রান্ত মতবাদের যোগসূত্র নয়। সোনা আমাকে আমার চারপাশের যান্ত্রিক রুটিনের পুনরাবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। প্রচণ্ড মাল টেনে কিংবা লাম্পট্য না করেও এই সাদামাটা শহরতলীর নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে, এই খোলাড্রেন, পানামজা পুকুরে, কলের তেল আর আর মরাগরু-ভাসা গঙ্গার পোড়ো ঘাটে, ঘুঁটে-লাগানো মন্দিরের দেয়ালের গায়ে গায়ে, খাটা পায়খানার ধারেই কোলাপসিবল গেট আঁটা ডালিয়ার টব শোভিত উঠতি মধ্যবিত্তের বাসভূমির গায়ে, এই ক্লান্তিকর রাজনৈতিক মিছিল জমায়েত আর পোস্টার সাঁটা জীবনেও এক আশ্চর্য ব্যাপ্তিবোধ এনেছিল। এটা এমন এক ধরনের ব্যাপ্তিবোধ যা আমাদের এই দীন অস্তিত্বের আস্তাকুঁড় আলো করে রাখে মানুষের অতীতের সংস্কৃতি আর ভবিষ্যৎ চিন্তায়। গত কয়েক বছরে তার মৈত্রী আমার জীবনে এমন এক গতিবেগ এনেছিল যে আমার চারপাশের জগতের অব্যবস্থা দৈন্য কিছুতেই কিছু এসে যায় না। আর সহসা সেই এক সজীব সম্পর্কের ছেদ পড়ায় আমার পা যেন জোয়ারের পর ভাঁটার কাদায় বসে গেল। মা-র সঙ্গে আলাপে অস্থিরতা চেপে রাখতে পারতাম না। কী হবে এই সব অতীত রোমন্থন করে? এই বর্তমানও তো দু'দিন পরই অতীত? মা একদিন বলেই ফেললেন, 'তুই গোনু, আজকাল কেমন অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিস।' আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'হয়তো।'

তাই কোন ফ্রয়েডীয় অবদমনের অগ্ন্যুৎপাতের অভিমুখে আমি ধাবিত হই নি বিনতার দিকে। আমি গিয়েছিলাম আমার ক্লান্তিকর প্রাত্যহিকতা পরিবর্তনের তাগিদে। কিন্তু গিয়ে বেকুব বনে গেলাম।

ঢুকতেই হাসির আওয়াজ। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটা ছোকরার প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও তার মুখে একটা চায়ের প্লেট গুঁজে দিচ্ছে বিনতা আর ছেলেটির দুই কষ বেয়ে মাংসের ঝোল গড়াচ্ছে। ছেলেটি আমাকে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে হাতের তেলোতে মুখ পুঁছতে পুঁছতে বললে, 'ধ্যাৎ। বলছি খাব না। তোর যত বাড়াবাড়ি!'

'তুমি যেন খাও না কোনদিন', বিনতা তাকে ভেঙিয়ে বললে। তারপর তার চোখ অনুসরণ করে আমার দিকে ফিরে লজ্জা পেয়ে বললে, 'আপনি? আমার ভাই।' মেয়েটির সঙ্গে আমার যে নতুন পরিচয়ের রঙ লেগেছিল তা বোধহয় একটু জ্বলে যায়। বোধহয় তাদের দুজনেরই পিঠোপিঠি বয়স এবং এক অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে দুজনকেই বেশ ঝলমলে লাগে। ছেলেটির তামাটে রোদে পোড়া শক্ত চেহারা।

'কী করেন?' নিরুৎসাহে প্রশ্ন করলাম।

'হোমগার্ড। একটা চাকরী দিন না। বিনতা আপনাদের ফ্যাক্টরীর কথা বলছিল। দেখুন না, কোন চাকরী খালি টালি থাকলে…'

খুব কম করে এযাবত আমাদের পাড়ার প্রায় শখানেক তরুণ ইতিমধ্যে আমাদের কারখানায় চাকরীর জন্যে অনুরোধ জানিয়েছে। তার মধ্যে দুটিকে আমাদের স্টোরে বদলির কাজে সোনার চেষ্টায় ঢোকানো গিয়েছে কিন্তু এখন রিক্রুটমেণ্ট একেবারে বন্ধ। চারপাশে ছাঁটাই ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসেশানের সুযোগ নিয়ে আমাদের কারখানায় গোটাকয়েক ছাঁটাইও হয়ে গেছে যদিও ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে আমাদের প্রায় মনোপলি কারবার এবং বাজারের মন্দা আমাদের সামান্য স্পর্শ করে নি।

'এখন আমাদের ওখানে কিছু হবে না। ছাঁটাই হচ্ছে।'

তরুণটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'সবাই একই কথা বলে। সেই একই কথা, কারখানায় লোক নিচ্ছে না, ছাঁটাই। আমরা কোথায় যাই বলুন তো?'

বিনতা বললে, 'তুই তো বেশ ছোটাইদা, ভদ্রলোক আসার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান্‌ভ্যান্‌ আরম্ভ করলি। এখন তো একটা কাজ করছিস। জলে তো পড়িস নি?'

'কী আর কাজ! হোমগার্ড। লাঠি হাতে রাস্তায় দাঁড়াই। তার জন্যে আমার কোন লাজলজ্জা নেই। কিন্তু যেরকম দিনকাল পড়েছে। ভয় লাগে, কবে গুণ্ডারা না মেরে দেয়।'

'তুই বড্ড ভীতু ছোটাইদা, গুণ্ডাদের সামনে রুখে দাঁড়াতে হয়। তাহলেই দেখবি ওরা কেঁচো হয়ে যাবে।'

'আজকাল আর সেই দিন নেই রে। কথায় কথায় বোমা ঝাড়ে, গুলি চালায়। হাতাহাতি হলে ভয় পেতাম না।'

বিনতা চা করতে যায়।

তরুণটি আমার দিকে চেয়ে নিজের মনেই বলে, 'আমাদের শ্যামল গাঙ্গুলীর পার্টিতে যাওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।'

'শ্যামল গাঙ্গুলী!' আমি একটু অবাক হই। 'আমি তো শুনেছি ও বসে গেছে।'

'বসে গেছে ঠিক নয়। আমাদের তল্লাটে আর কিছু করতে সাহস পায় না। আমাদের এ অঞ্চলে তো জানেন· ·' আমার দিকে অর্থপূর্ণভাবে ছোকরাটি চেয়ে বললে, 'আমাদের এখানে সূর্য ব্যানার্জির ফতোয়া জারি হয়েছে।'

আমি কৌতূহলী হই। আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে বললে, 'আপনি তো জানেন স্যার, কেন আমার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন।'

আমি চুপ করে থাকায় বললে, 'আপনাদের কারখানারই তো লোক, আপনার বন্ধু নিশ্চয়।'

আমি সতর্কভাবে তাকাই। বিনতার বাড়িতে আসাটা হঠাৎ পানসে লাগে। সাবধানে বলি, 'আমাদের কারখানায় কাজ করে। কারখানায় দেড়হাজার লোক কাজ করে।'

'আমি স্যার একজন হোমগার্ড। আমরা এখানেই বড় হয়েছি। সূর্যদা মহাপুরুষ লোক। সূর্যদাকে আমি চিনি। সূর্যদা বলেছে, শ্যামল গাঙ্গুলী এদিকে এলেই ওকে গুলি করে মারা হবে।'

বিনতা চা নিয়ে এল। আমি যে নির্ঝঞ্ঝাট নিরিবিলি সন্ধের বদলে এরকম বিপজ্জনক কথাবার্তার মধ্যে গিয়ে পড়ব ভাবি নি।

বিনতা কিন্তু এসেই তার ছোটাইদাকে ধমকালে, 'আচ্ছা তুই কি এক মিনিট রাজনীতি ছাড়া কথা বলতে পারিস না। সূর্যদা ভাল কি

মন্দ, তাতে তোর কী হয়েছে ! তোর মাইনে বাড়বে ? বলুন তো।' বলে আমার দিকে চেয়ে হাসলে বিনতা।

শ্যামল গাঙ্গুলী এ অঞ্চলের কেন পাশাপাশি অঞ্চলেও এক বিখ্যাত ওয়াগনব্রেকার। কোন কেসে হাতেনাতে সে ধরা পড়ে নি। খালি আসামীদের উকিল জোগাড় করে খালাস করার ব্যাপারে তার তৎপরতা লক্ষিত হয়েছে। বড় রাস্তার মোড় ছেড়ে গলির মুখে মজা পুকুরটার গায়ে বাহারে জানলার ঝকঝকে গ্রীলওয়ালা নতুন তেতলা বাড়িটার মালিক শ্যামল গাঙ্গুলী। যখন যে রাজনৈতিক পার্টি জোরাল শ্যামল গাঙ্গুলী তার প্রবল সমর্থক।

চা খেতে খেতে আমি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, 'শ্যামল গাঙ্গুলী উঠে গেছে ?'

'হ্যাঁ, ওঁর দমদমের বাড়ি থেকে এখন অপারেট করছে।'

বিনতা উঠে গিয়ে গ্রামোফোনে ফৈজ খাঁর 'বন্দে নন্দকুমার' গানটা রেকর্ডে বাজায়। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'বাবার এই সব কালোয়াতি গান পছন্দ। আমার এইসব আ-আ-আ, আ-আ-আ একদম অপছন্দ। আমার সেই গানটা খুব ভাল লাগে। ছোটাইদা শুনিস নি—'তুমি নেই, আমি নেই, আছে শুধু এক ঝাঁক পায়রা ?'

একটা সুরও ভেঁজে দিলে মেয়েটা। আমি হেসে উঠে বললাম, 'বাঃ তুমি তো বেশ গাও।'

গ্যারাজে গাড়ি তোলার শব্দ এল। কিছুক্ষণ পরই বিরাট দশাশয়ী চেহারা কান্তিবাবু ঢুকলেন। কাল লক্ষ করি নি ভাল করে। বেশ এক জোড়া দারোয়ানী গোঁফ। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন, 'আপনার জন্যে স্যার আমার প্রাণটা বেঁচে গেছে। আপনি স্যার আমার এখানে আজ খেয়ে যাবেন।'

আমি উঠে পড়ে বললাম, 'আর একদিন হবে। আজ আর নয়।'

'সে কী স্যার। এখনই যাবেন, না-না, তা হয় না। বাড়িতে ভাল না লাগলে, চলুন, বাজারে চলুন। আপনার তো স্যার দিশী চলবে না।

তবে কী জানেন, দিশীটা যদি একবার রপ্ত করতে পারেন, আর কিছু ভাল লাগবে না।' তারপর ছোটাইয়ের দিকে চেয়ে অপ্রতিভভাবে বললেন, 'ও, তুইও আছিস। আচ্ছা, আপনি যখন স্যার বসবেন না, তাহলে সামনের রোববারে আসুন। আপনি কী খেতে ভালবাসেন? 'কই মাছ আর মুর্গী? তাইতো? ঠিক আছে, সামনের রোববার। নইলে কিন্তু মনে করব, ট্যাক্সি চালাই...'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না না, আমি আসব। আপনার কিছু মনে করতে হবে না।'

কই মাছ আর মুর্গীর জন্যে আমি সেদিন আমার পড়শী কান্তিবাবুর বাড়ি যাই নি যদিও চমৎকার রান্না করেছিল তার মেয়ে, বিনতা, এবং সেই কব্জিডুবানো খাওয়ার তৃপ্তিতে বেশ মেজাজটা খুশি করেই বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই সোনার সান্নিধ্যের অভাবে চারপাশের দৈনন্দিন অস্তিত্ব ক্রমশ বিবর্ণ রংজ্বলা হয়ে দাঁড়াতে লাগল। বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে, সোনার মতো যদি কবিতার মধ্যে দিয়ে আমি আমার দেশ ও কালকে দেখতে না শিখতাম তাহলে আমাদের ফ্যাক্টরীর নতুন দিল্লী ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার হবার চেষ্টা করতাম নিশ্চয়। পোচখানেওয়ালাও আমাকে প্রোমোশনের আঁচ দিয়েছিল দিল্লী গেলেই। আর আমার অফিস কেন, কিছু আত্মীয়দের মধ্যেও এই প্রবণতা বেশ লক্ষ করা যাচ্ছে।

আমাদের অফিসের বাঙালী অফিসারদের ছোট ভাইরা ক্যানাডা আমেরিকা যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরী নিয়ে আর আমাদের মতো নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা চেষ্টা করছে বোম্বাই দিল্লীর দিকে ভাগ্যসন্ধানে। আমরা এখানে যারা আছি, এই শহরতলীর খোলা ড্রেন, ধুলো, ঘাম আর ভিড়ে টলমল বাস আঁকড়ে, তারা বাঁচতে চেষ্টা করছি লাল পতাকার কবিতার আশ্রয়ে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার উঠতি মধ্যবিত্তেরা আমাদের বুঝতে পারে না, বুঝতে না পারাই স্বাভাবিক। আমাদের তো কিছু একটা নিয়ে বাঁচতে হবে, কোন একটা কিছুর স্বপ্ন নিয়ে। যারা খানিকটা গুছিয়ে নিয়েছে বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর জয়গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এইসব জিনিস আছে তাদের জন্যে। কিন্তু এই সব সভাসমিতিতে কেন উদ্যোক্তারা ছাড়া দর্শকের আসন শূন্যই থাকে সে সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসা খুব কম। মানুষ কতদিন মড়া কাঁধে করে ঘুরবে? তাছাড়া উত্তর ভারতে এই সব মড়া কাঁধে বওয়ার পরিশ্রম পোষায়। সেখানে নিম্নমধ্যবিত্তের দারিদ্র এমন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে নেই, এক স্থান

থেকে আর এক স্থানে যেতে, কিংবা স্রেফ বাড়িতে থাকতে এত হুজ্জুত পোয়াতে হয় না। এত লাখ লাখ শিক্ষিত মানুষ হ্যাংলার মতো হাত বাড়িয়ে নেই চারপাশে। কাজেই এখানে, বাংলাদেশে, একটা কবিতার প্রয়োজন।

আমার অবশ্য স্পেশাল কেস্। কারণ ঠিক ময়দানের লাল পতাকার গানে আমার শানায় না। লালপতাকা অবলম্বন করে যে সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন মানুষের সামনে ছড়িয়ে আছে, যা শুধুমাত্র কয়েকজন রাজনৈতিক অবতারকেন্দ্রিক নেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যা একই সঙ্গে নিজেকে ও চারপাশের জগতকে বুঝতে সাহায্য করে সেই এক নতুন ধরনের কবিতা আমাকে অভিভূত করে। তার মাঝখানে আমি বুঁদ হয়ে থাকতে চাই এমনভাবে, যাতে রাজনৈতিক নেতাদের অজস্র মাথামোটামি, প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের মতো তাদের রোয়াব আমাকে স্পর্শ না করে। সোনা, আমার নেতা, এই স্বপ্নের ছবি আমার সামনে তুলে ধরেছে। 'যখন কোন স্বপ্ন নেই ঠিক তখনই স্বপ্ন দেখার সময়', এটা তারই খুব প্রিয় কথা। 'স্বপ্ন দেখতে হবে নইলে বাজার থেকে দিশী খেয়ে বউ ঠেঙ্গাবেন, ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কোন বোধ থাকবে না, কিংবা বড়জোর হবেন তালেবর বস্, আমাদের সমাজের আদরের ম্যাওপুসি, সাক্সেসফুল কিন্তু একেবারে পয়েণ্টলেস, শেষপর্যন্ত জীবনের একমাত্র আদর্শ নিজের ছেলেটিকে সাহেব বানানো।' তারপর সে চীৎকার করে উঠেছে, 'চেঞ্জ চেঞ্জ, বংশীবাবু চেঞ্জ। সবকিছু পাল্টে দিতে হবে। স্বপ্ন শুধু কৈশোরের সম্পত্তি নয়, স্বপ্ন সাবালকের জন্যে। এই সাবালকের স্বপ্নই হোল কমিউনিজম।'

সোনা আমাকে মাঝে মাঝে ইংরেজী কবিতাও পড়াত। ডবলিউ বি ইয়েটস তার প্রিয় কবি ছিল। 'আমাদের দেশে এখন যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা এইরকম সাদামাটা অথচ গভীরভাবে কথা বলতে পারেন না কেন? গভীরভাবে বলতে গেলেই কি খুব সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হবে, লোকের সামনে দাঁড়াতে গেলেই কি স্নো-পাউডার মেখে দাঁড়াতে হবে?'

জানিনা, আমাদের জীবদ্দশায় সোনার এই কবিতা কখনও জীবন্ত হয়ে উঠবে কিনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। কিন্তু এই কবিতাই আমাকে ডুবিয়েছিল। তবে সোনার সঙ্গে মেশার পর আমি যখন বিনতার কাছে এলাম তখন আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে হোল। বিনতার কবিতা একদম আলাদা জাতের। সোনা আমাকে ভবিষ্যতের নেমন্তন্ন করেছিল কিন্তু বিনতার নেমন্তন্ন এই মুহূর্তের জন্যে। সোনার পাশে সে স্থূল কিন্তু তার এক রক্তমাংসময় স্বাভাবিকতা আমাকে আচ্ছন্ন করল। সে যেন সন্ধে হতে না হতেই হাতছানি দিয়ে ডেকে আমাকে বলে, 'মশাই, ও সব ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ কানা করবেন না। চারপাশটা আরও ভাল করে চেয়ে দেখুন। আমার পাশে এসে বসুন। আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখুন, ভাল লাগে না? আমার গায়ের গন্ধস্পর্শ আপনার রক্তে সাড়া জাগায় না? এই ধোঁয়া ধুলোর মধ্যেই আমার পাশে বসতে ইচ্ছে করে না? আপনি যে নির্ধূম আকাশের স্বপ্ন দেখছেন, যে নির্মল বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার কথা ভাবছেন, তা যদি না আসে তাহলেই কি আমাদের জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ? নাই-মামার চেয়ে কানামামা সবসময় ভাল। এই কানামামাদের নিয়েই মানুষের জীবন। আদর্শ পুরুষরা বইয়ের পাতায় থাকে, রাস্তায় যারা হাঁটে, তারা আদর্শ নয় কিন্তু তারা জ্যান্ত।'

যত দিন যেতে থাকে ততো এই রক্তমাংসের কবিতার আহ্বান আমার কাছে অপ্রতিরোধ্য লাগে। ইতিমধ্যে প্রায় মাস তিনেক হতে চলল সোনার কোন পাত্তা নেই। কারখানায় রমেন দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করে, সোনা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গিয়েছে কিনা এবং রমেনকে দেখামাত্র আমি সিঁটিয়ে পড়ি। ঠিক আমাদের এ অঞ্চলে না ঘটলেও রোজই কাগজে কমিউনিস্ট পার্টির তিনটে প্রধান দলের মধ্যে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ এবং হত্যার কাহিনী বেরোতে থাকে। আমাদের অঞ্চলের ঠিক বাইরেই এই সব কাণ্ড হামেশা ঘটবার রিপোর্ট পড়ি কিন্তু শ্রেণীশত্রুর নামে এই ভ্রাতৃহত্যা আমাদের অঞ্চলে একেবারেই ঘটে নি।

একদিন কারখানা থেকে ফিরে কার্তিক ক্যাবিনে চা খেয়ে উঠেছি। সেদিন একটু দেরী করে ফিরছি। আকাশে মেঘ, ঝিরঝিরে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। দেখি একটা চাদর মুড়ি দিয়ে আরু চলেছে।

আমি কি করব বুঝতে পারলাম না। কারণ আরু এখন এ অঞ্চলের স্কোয়াডের নেতা। চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিলাম। কিন্তু আরুই এগিয়ে এসে বললে, 'আপনার বন্ধুটির জন্যেই আমাদের এখানে কিছু হচ্ছে না।'

সাবধানে বললাম, 'কী হচ্ছে না?'

'চারদিকে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠছে। শহর অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রেণীশত্রু খতমের অভিযান চরমে উঠেছে। কিন্তু দাদা একটা অদ্ভুত স্ট্যাণ্ড নিয়েছে—একেবারে অপারচুনিষ্ট স্ট্যাণ্ড। দাদা এখানে হুকুম দিয়েছে কী জানেন? দাদা হুকুম দিয়েছে, কোন রাজনৈতিক পার্টির ওয়ার্কারের গায়ে হাত দেবে না। এটাকে সিয়ার অপারচুনিজম্ ছাড়া কী বলব? তবে বেশীদিন ট্যাঁ ফোঁ করতে হবে না বলে দিচ্ছি। আমাদের সংগ্রাম আরও অনেক উন্নত স্তরে উঠে যাবে।'

সত্যি কথা বলতে কি, আরুর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভয় হোল। এমন টান-টান উদ্‌গ্রীব লড়াকু চেহারা বানিয়েছে এই দু-তিন মাসের মধ্যেই যে, সেই কচিবাঁশের কেঁপে ওঠার স্মৃতিটা ধাক্কা খেল।

'মা কেমন আছেন?'

আরু আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, 'আমাদের সব ফ্রন্টই দেখতে হবে? আপনারা আছেন কেন? একবার মার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আরু মিলিয়ে গেল। আরুর কথার মধ্যে এমন একটা সত্যের ঝাঁঝ ছিল, যা আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। আমার বন্ধুর নির্দেশ অমান্য করেই পরদিন কারখানা ফেরতা তাদের বাড়ি হাজির হলাম।

সূর্য ব্যানার্জির মা প্রথম কথাই বললেন, 'তুমি এলে? না এলেই

পারতে।' তারপর জানলার বাহিরে দুটি সাদাপোষাকের পুলিশের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, 'সব সময় বসে আছে। কখনও কখনও রাত্তিরেও ঢুকে পড়ে। একদিন সারা সন্ধে ধমক দিয়ে গেল—সূর্য ব্যানার্জির রিভলবারটা কোথায় আছে বলে দিন।'

সঙ্কোচের সঙ্গে আর্থিকসাহায্য প্রসঙ্গ তুলতে না-তুলতেই খুব সোজাসুজি সাড়া পাওয়া গেল। 'ইস্কুল তো মাসতিনেক হোল প্রায় বন্ধ। দুবার তিনবার অফিসের কাগজপত্তর পুড়েছে। মাইনে ঠিকমতো পেলে খুব অসুবিধে হোত না। সোনাটা একেবারে সব ফুঁকে দিয়ে চলে গেল। আমরা যে জনপ্রাণী বলে কেউ আছি একবার ভাবলেও না।'

ফ্রকপরা তেরো-চোদ্দ বছরের একটা কালো মেয়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়। তার দিকে চেয়ে সূর্যের মা বললেন, 'আমার আটার গোলাতে কোন অসুবিধে হয় না। একটু পেটের গণ্ডগোল হয়। তা এখন তো বয়স হচ্ছে। ভাত খেলেও হোত। সমস্যা মেয়েটাকে নিয়ে। রোজ রোজ আটার গোলা খেতে পারে না।'

ঠিক হোল তাঁর স্কুলের একটি মেয়ে টিচার রাণু, আমার সঙ্গে মাসের প্রথমে যোগাযোগ করবে। আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ খুবই সামান্য। তিন ভাই পলাতক। দুটি প্রাণীর জন্যে রেশান ও আনাজপাতি বাবদ সামান্য অর্থ। আমি প্রথম মাস বাবদ টাকা দিয়ে এলাম।

দিয়ে ভালই করেছিলাম কারণ পরদিনই থানা থেকে ডাক এল। বোধহয় সূর্য ব্যানার্জির হুকুমে আমাদের এ অঞ্চল তখনও অপেক্ষাকৃত শান্ত, আরুর যথেষ্ট উৎসাহ সত্ত্বেও এবং দাদাকে শোধনবাদীদের হাতের পুতুল ইত্যাদি আখ্যা দিলেও সূর্য ব্যানার্জির নিষেধ তখনও বলবৎ ছিল। থানা অফিসারও বোধহয় সেজন্যে আমাকে রেয়াৎ করলেন। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে থানায় ডাক পড়লেই যে রুটিন-মাফিক ধোলাইয়ের ইতিহাস তৈরী হয়েছিল সে ইতিহাস তখনও এ অঞ্চলে সুরু হয়নি। থানা অফিসার বললেন, 'এবারে ছেড়ে দিলাম। আর ওদিকে পা মাড়ালে ছাড়ব না।'

সূর্য ব্যানার্জির অন্তর্ধানের প্রথম ছটা মাস আমাদের অঞ্চলে তার পার্টির বিজয়কেতন পতপত করে উড়েছিল। আমাদের অঞ্চলের বারো থেকে বত্রিশ পর্যন্ত বালক যুবক তার দিকে এবং তাদের পার্টির দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। তার মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। প্রবল আক্রোশ ছিল, অতীতের ভালমন্দ সব কিছু অগ্রাহ্য করার গোঁয়ার্তুমিও ছিল, কিন্তু সব মিলে মিশে মনে হোল, স্বাধীনতাপরবর্তী যে পাথর আমাদের তরুণ সমাজের বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সমাজের বুকের ওপর চেপে আছে তা নড়ে উঠল। শুধু শ্যামল গাঙ্গুলীর মতো ওয়াগন-ব্রেকারের নেতারাই নন, সেই সব লোকজন যারা যখন যেমন তখন তেমন দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে জোঁকের মতো সমাজের সব রস শুষে খাচ্ছে তারাও তটস্থ আতঙ্কিত। এই আতঙ্কের প্রয়োজন ছিল। আমি নিজে ভীতু, আমার জীবনচর্চায় এই সমাজব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছি কিন্তু আমার মন পড়ে আছে উদগ্রীব হয়ে তাদের জন্যে, যারা সবকিছু ওলোটপালট করে দিতে প্রস্তুত, যারা জেনেছে শুধু স্লোগানে চিঁড়ে ভেজে না, চিঁড়ে ভেজাতে হলে রক্তে ভেজাতে হয় রাজপথ।

আমাদের গঙ্গার ধারে এই নতুন চেতনার বৈজয়ন্তী উড়তে দেখে-ছিলাম জেলেদের বস্তিতে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা লেনিন পড়ছে, মাও সে তুং পড়ছে। এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। আমরা সবাই তার শরিক, আমরা সবাই আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা এই বোধ বিদ্যুতের মতো আমাদের এ অঞ্চলকে এক উদ্দীপনায় তাড়িত করেছে। আমি রাজনৈতিক সূক্ষ্মবিচারে খুব দড় ছিলাম না, কিন্তু মানুষকে যদি তার একলা প্রাণের নরক থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, যদি কোন অবতারের কাঁধে না চেপেই কেবল আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে চলবার সাহস অর্জন করতে হয়, তাহলে সেই বছরের গোটা হেমন্ত শীত বসন্ত আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তখন কি জানতাম এই বিরাট প্রাণের উৎসবের লক্ষ্য এক বিশাল শোকযাত্রা? আমাদের চারপাশের এই কলরব শুধু এক সমাধিক্ষেত্রের

নৈঃশব্দের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে ? এবং আমার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা, যা আমার হৃদয়ের সম্পদ তা হবে স্মৃতির নামান্তর ? কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আমি উৎসবের কথা না বলি, যদি দুর্দমনীয় আশার সঞ্জীবনীশক্তি আমার কলমে ভাষা না পায় তাহলে এ রচনা মিথ্যে। কারণ আমার আটাশ-উনত্রিশ বছরের জীবনে এই প্রথম নড়ে উঠেছিলাম। আমাদের অহল্যা-অস্তিত্বে এই আলোড়ন সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। সর্বত্র পরিবর্তনের এই নতুন চারা অঙ্কুর মেলেছিল। আমার চোখের সামনে আমাদের অতিপরিচিত আলকাতরা লাঞ্ছিত শহরতলীর পোড়োদালান দোকান খোলা ড্রেন আর ফুটপাতহীন সরু রাস্তায় গায়ে-পড়া বাস আর মাস্তানী চীৎকার সবই এক স্বর্গরাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল। আর আমি এই কটা মাস প্রচণ্ড গর্বে দুলেছিলাম কারণ, এই পরিবর্তনের মহানায়ক আমার বন্ধু। আমি স্বপ্ন দেখতাম সূর্য ব্যানার্জির চিন্তা শুধু তার পার্টিই নয় সমস্ত তরুণ সমাজকে প্রভাবিত করছে। যে গভীরতা ও ব্যাপ্তি-বোধের অভাবে আমাদের বামপন্থী মহলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা বারবার খণ্ডিত হয়েছে তার অবসান ঘটবে। সেই যে খবরের কাগজের হেডলাইনে রাজনৈতিক নেতাদের কথায় অথবা এক ধরনের প্রাণহীন কবিতায় নতুন সূর্যোদয়ের কথা বলা হয় সেই সূর্যোদয় ঘটবে আমাদেরই জীবদ্দশায়।

আমি এক আশ্চর্য দ্বৈতসত্তায় দুলেছি এ কয়মাস। এই মুহূর্তে আমার যে অস্তিত্ব তার প্রধান আকর্ষণ রূপে হাজির হয় বিনতা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়, আর সারাদিন কারখানায় ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলেই হাজির হয় সূর্য, আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা। সমস্ত সকাল-সন্ধেগুলো এইভাবে তোলপাড় করেছে। আমার এই জীবনের এক নতুন পর্ব সুরু হল যার সঙ্গে আমার আগের জীবন, আমার বাবার কেমিক্যাল ইউনিটের সুপারভাইজারি, বাড়িতে এসে মায়ের সঙ্গে গল্প কিংবা কিছু পড়াশোনা চিন্তা এগুলো সব ভেসে গেল। এক নতুন ভাবনায় আমি আচ্ছন্ন সর্বক্ষণ। সূর্যের পার্টি কোথায় কোথায় নতুন অ্যাকশান করছে এবং

তার পরিণতি কী, তা কি লোকে গ্রহণ করছে, আমাদের অঞ্চলের লোকেরা কী বলছে, কী ভাবছে এ সম্পর্কে, এরপর কী ঘটবে ? সত্যিই কি সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সারা ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়েছে ? আরুরা যা আলকাতরায় লিখছে সেগুলো বাস্তবিক সত্যি না মনের মাধুরী !

আজকাল ভোরে কার্তিকের ক্যাবিনে চা না খেয়ে কারখানার গেটের সামনে মানিক দাসের আস্তানায় চা-বিস্কুট খেতাম। ক্লাস-টু পর্যন্ত পড়েছে মানিক দাস, দু'ছেলের বাবা, কালো কুচকুচে মোটাসোটা চেহারা। চায়ের কাপটা নামাতে নামাতে বললে, 'আজ রাত দশটায় আপনার বাড়িতে যাবে সূর্য। আপনাকে বলতে বলেছে।'

ইতিমধ্যে বিনতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনীভূত হয়েছে। আমরা দুজনেই দুজনের কাছে প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়েছি, অন্তত অপরিহার্য প্রত্যেক সন্ধেবেলার একটি ঘণ্টা। এই একটি ঘণ্টার প্রতীক্ষা আমাদের দুজনের মনেই দাঁড়িয়ে থাকে বিকেল পড়ে এলেই। আমি বুঝতে পারছিলাম মা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, কার্তিক ক্যাবিনে আড্ডা দিই। কিন্তু মা বোধহয় আমার কথা অবিশ্বাস করেছেন। একদিন খোলাখুলি বললেন, 'তোর তো গোনু চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়ার বাতিক ছিল না। আর কোথাও যাস ?' আমি উত্তরে চারপাশের রাজনৈতিক উত্তেজনার কথা বলেছি, চায়ের দোকানে আজকাল অনেক খবর পাওয়া যায় এরকম আভাস দিয়েছি। কিন্তু মা-র মুখে ভাবান্তর ঘটে নি।

সেদিন অবশ্য বিনতার কাছে যাইনি। আমাকে বসে থাকতে দেখে মা বললেন, 'আজ বেরোলি না ?'

'শরীরটা ভাল লাগছে না।'

মা আমার দিকে তাঁর বড় বড় চোখ দুটি রেখে বললেন, 'তুই আজ-কাল গোনু কিরকম হয়ে গেছিস যেন।'

একটা ইংরেজী গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললাম, 'সব

কিছু পাল্টে যায় মা, কোন কিছু একরকম থাকে না।'

মা জোর দিয়ে বললেন, 'মানুষের মধ্যে যা ভাল তা কখনও পাল্টায় না।'

'তাও পাল্টায়। ভাল ক্ষয়ে যায়, আবার নতুন ভাল জন্মায়।'

মা কি একটা কথা বলি বলি করেও বলেন না, চুপ করে থাকেন।

আমি হেসে বললাম, 'কিছু বলছো ?'

'আচ্ছা, পাশের বাড়ির মেয়েটা তোর দিকে অমন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকে কেন রে ? তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি ?'

আমি সাবধানে মা-র দিকে তাকাই। 'হ্যাঁ, ওর বাবা ট্যাক্সি চালায়। একদিন পাড়ার একটা গণ্ডগোল হয়েছিল।'

'কী গণ্ডগোল ?'

মদ্যপানের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বললাম, 'কী সব পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝামেলা।'

'তুই গিয়ে মেটালি বুঝি ?'

আমি ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণুতাবোধ করছিলাম। মা চিরকাল নিজের মনের মধ্যে থাকেন, তাঁর চারপাশে নানা ঘটনা ঘটে গেলেও তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার অভ্যাস তিনি আশ্চর্যরকম আয়ত্ত করেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমার বরাবর শ্রদ্ধা ছিল। বিশেষ করে বাবা যখন তাঁর প্রকাণ্ড বৈপরীত্যে হাজির হতেন তখন মার নীরব উপেক্ষায় দাঁড়ানো আমার কাছে দারুণ প্রশংসনীয় মনে হয়েছে। সেই মা হঠাৎ বিনতার ব্যাপারে কেন জড়িয়ে পড়ছেন ভেবে অবাক হলাম। পরিষ্কার বলেও বসলাম, 'তুমি বলছিলে মা আমি পাল্টে গেছি। আমি দেখছি তুমিও পাল্টে গেছ। তোমার তো আগে এসব কৌতূহল ছিল না। এখন কেন হচ্ছে ?'

মা চুপ করে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। আর একটি কথা বলেন না। তাঁর এই নীরবতা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শ করে। একবার ভাবি, বলেই দেব সমস্ত ব্যাপারটা। অন্তত বিনতার সঙ্গে সম্পর্ক যে

নেহাৎ একটা আপতিক আলাপ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেরকম আঁচ দিলে কেমন হয় ভাবলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। বিনতার সঙ্গে সম্পর্কের লক্ষ্য কী তা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়, বিনতার প্রগাঢ় আলিঙ্গন সত্ত্বেও। আমি সূর্য ব্যানার্জির মতো বিপ্লবী নয় সত্য কিন্তু আমি যে আমার বাবার মতই হয়ে পড়ব না তার গ্যারান্টি কোথায়? এই মুহূর্তে আমার বিবাহ আমাকে আমার বাবা হবার রাস্তায় ঠেলে দেবে, আমাকে পোচখানেওয়ালার কথাবার্তা শুনবার ও পালন করবার আগ্রহ জাগিয়ে দিয়ে সূর্য ব্যানার্জির পরিত্যক্ত পোস্টে আমাকে প্রোমোশন নিতে সাহায্য করবে। এই চরম ভবিতব্যকে কি ঠেকিয়ে রাখা যায় না?

আমি জানি আমার চিন্তায় অনেক অসংলগ্নতা ছিল। আমি চাই আমার এই অসংলগ্নতাগুলো চেপে না গিয়ে প্রকাশ করি। কারণ আমি বংশী মিত্তির অতি সাধারণ, একেবারে সাধারণ। আমার সাধারণত্ব পাঠকের কাছে একমাত্র সহনীয় হতে পারে আমি এক অসাধারণ কাহিনীব আধার হতে সচেষ্ট বলে। বিনতা প্রসঙ্গে আমি সূর্য ব্যানার্জির ভাবনা চিন্তা থেকে আলাদা। সে নিশ্চয় কোনো খেলো অসামাজিকতার প্রশ্রয় দিত না। সূর্যের অভাবেই তো আমি বিনতার কাছে এলাম এবং আমাদের সম্পূর্ণ মিলনের বাধাও তো সূর্য ব্যানার্জি। অর্থাৎ অরণ্যের গভীর কন্দরেও যে সূর্যের আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ করে আমার অভিজ্ঞতা তারই সাক্ষ্য।

আমি তাই সে সন্ধেবেলায় মায়ের নীরবতাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতে পারলাম না। আর সন্ধে বাড়তেই অন্য চিন্তা আমার মন আচ্ছন্ন করল। মা বললেন, 'তুই আজ ভাল করে খেলি না।' সত্যিই সূর্যের উদয়ের প্রতীক্ষায় আমার খিদে চলে গিয়েছিল। আর মা শুয়ে পড়লে, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটায় সূর্যোদয় হল।

আমি আলো নিভিয়ে বিছানায় বসেছিলাম। সূর্য হাল্কা পায়ে দরজা ঠেলে ঘরে এসেই আমার পাশে বসল। আমি প্রথমে চমকে গিয়েছিলাম।

কারণ পরণে লুঙ্গি আর ময়লা তেলচিটে গেঞ্জি। চুলগুলো কদমছাঁট করে ছাঁটা। মাথা দিয়ে সর্ষের তেল গড়িয়ে পড়ছে। খালি পা ধুলোয় ভরা।

'পা তুলে বসুন, কিছু হবে না।'

সূর্য যেরকম বসেছিল তেমনি বসে থাকে। আস্তে আস্তে বললে, 'আরু ধরা পড়েছে।'

'কবে? কবে?' আমি বিশ্বাস করতে পারি না তার কথা।

'কাল মাঝরাতে ওদের আস্তানা থেকে। মুখুজ্জেপাড়া থেকে আমাদের তিনজন কমরেড ধরে নিয়ে গিয়েছিল গত সপ্তাহে। দুজন পুলিশের মার সহ্য করতে পেরেছিল। আর একজন পারে নি। তার কাছ থেকে খবর পেয়েই পুলিশ আসে। আপনি এখন আর মানিক দাসের দোকানে যাবেন না। হয়তো ও আস্তানারও খবর পেয়েছে।'

সূর্য বিড়ি ধরায়।

'কিছু খাবেন?'

'না না, বসুন।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আমাদের অঞ্চলের চেহারাটা পাল্টে যাবে। শহরে অ্যাকসান শুরু হয়েছে। এখানেও হবে। আরু ধরা পড়েছে। কিন্তু আরুরা জিতে গেছে। আমি মাইনরিটি হয়ে গেলাম, জানেন।'

আমি চুপ করে থাকি। একবার ভাবলাম বলি, এসব কথা বোধ হয় আমাকে বলা ঠিক হচ্ছে না, কারণ আমি তো নিজে ভীতু ভঙ্গুর প্রাণী, আমাকে যদি পুলিশ পেটায় তাহলে আমি চুপ করে থাকতে পারব না।

'আপনার গাঁয়ের কথা বলুন।'

'গাঁ?' সূর্য ব্যানার্জি প্রকাণ্ড হাই তোলে। ঘরের মধ্যে যে রাস্তার আলো এসে পড়েছে সেই স্বল্পআলোয় দেখলাম, ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এসেছে।

'আপনার ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়ুন।' বলতে আমার একটু খারাপই

লাগছিল। কারণ ভেবেছিলাম সারারাত তার সঙ্গে গল্প করব। কিন্তু সেই প্রবল অবসাদের মূর্তির দিকে চেয়ে আমার মায়া হোল।

সূর্য দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি মেঝেতে ছুটো মাছুর পাতি। ছোট টেবিলটা সরানোর শব্দে তার তন্দ্রা কেটে যায়। আড়-মোড়া ভেঙে উঠে মাছুরে এসে বসে। বলে, 'ঘুমোব, আর একটু পরে।'

আবার একটা বিড়ি ধরায় সোনা। চোখ বন্ধ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'সবচেয়ে কঠিন কী জানেন? গাঁয়ে থাকা।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি মশাই, তাহলে কৃষিবিপ্লব করবেন কী করে?'

এক হাত শূন্যে তুলে সোনা বলে, 'বলছি, বলছি। গাঁয়ে থাকা সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। সেই যে কবিতায় আছে—নম নম নম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি,—সে গ্রাম সম্পন্ন জোতদারের গ্রাম অথবা ট্রেনের কামরা থেকে দেখা গ্রাম। অথবা হয়তো একশো বছর আগে—কিন্তু তাই বা কি করে হবে। আমি যাদের মধ্যে আছি তাদের কাছে কোনকালেই গাঁয়ের চেহারা মধুর ছিল না, চার পয়সা যখন চালের সের তখনও তারা পেট চাপড়েছে আর এখন তো মরবেই।'

আবার বিড়ি টানে সোনা। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে, 'আমরা মোটামুটি যারা শিক্ষিত আর গাঁয়ের যারা গরীব চাষী তারা শুধু ছু'শ্রেণীর লোক বললেই ঠিক পার্থক্যটা ধরা পড়ে না, বলতে কি আমরা ছুই গ্রহের লোক। আমাদের চেহারা, বেশভূষা, কথাবার্তা, ভাবনা-চিন্তা, ভাললাগা-খারাপ-লাগা একেবারে সম্পূর্ণ অন্য জগতের, আপনি বিশ্বাস করুন। আমি যখন প্রথম গেলাম—রোজ সন্ধেবেলা চোখের জল ফেলতাম। এইখানে, এইসব লোকের মাঝখানে বিপ্লবের কথা বলব ভেবে নিজেই মনে মনে হাসতাম। কলকাতা কিংবা কোন শহরতলীতে কিংবা মহকুমা শহরে বসে বিপ্লবের কথা মধ্যবিত্ত ঘরের একটা ছেলেকে বোঝানো অনেক সোজা ব্যাপার। সে তো তবু কিছু

পেয়েছে, তাই তার আরও কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। যে ধুতি পরে সে প্যাণ্ট পরতে চায়, যে কেরাণী সে অফিসার হতে চায়, যে মহকুমা শহরে থাকে সে কলকাতায় আসতে চায়, যে শহরতলীতে থাকে সে কলকাতার ভাল জায়গায় ফ্ল্যাট নিতে চায়, ছেলেদের ইংরেজী স্কুলে পাঠাতে চায়—এই সমস্ত চিন্তাই তার মনের মধ্যে একটা অভাববোধ সৃষ্টি করে। আমরা যখন সেই অবস্থায় লালপতাকার গান করি তখন এই সমস্ত অভাববোধ এক আশ্চর্য সমাধানের পথ খুঁজে পায়। কমিউ-নিজম্ কী সেটা খুব একটা তলিয়ে দেখার দরকার হয় না। এমন একটা পরিবর্তন চোখের সামনে ভেসে ওঠে যা শহরের মধ্যবিত্তের এইসব অভাববোধ অবসানের একটা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ লক্ষ্য অনেকাংশে বায়বীয়। তাই ছাত্র আন্দোলনে যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা দুদিন পর মধ্যবিত্তশ্রেণীর মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে কেরিয়ার তৈরী করে। এ সমস্ত আপনিও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু গ্রাম আমরা জানি না।'

আবার চুপ করে থাকে সোনা। বহুদূর থেকে বোমার আওয়াজ আসে। আমাদের পাশাপাশি দু'তিনটে পাড়া ছাড়িয়ে কয়েকদিন হল এক নতুন ধরনের শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়েছে। গুলি ও বোমার আঘাতে পাঁচ ছটি তরুণের মৃত্যু ঘটেছে।

'আপনি হয়তো অবাক হবেন,' সোনা বলে, 'আর আপনি কেন, যাকেই বলেছি পার্টির মধ্যে, কথাটা প্রায় উড়িয়ে দেয়। আমার মনে হচ্ছে, গরীব চাষীরা যদি আর একটু কম গরীব হোত, অন্তত দু'বেলা ভাত খেতে পারত, সামান্য কাপড়জামা পরতে পারত তাহলে কৃষিবিপ্লব আরও ত্বরান্বিত হোত।'

'আপনি যে মশাই অদ্ভুত কথা বলছেন। মানুষ প্রচণ্ড দরিদ্র বলেই প্রচণ্ড পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকবে।'

সোনা হাসল। 'আমি যাকেই বলেছি সেই ঠিক আপনার মতো বলেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এটা আমাদের ভুল ভাবনা। আমি যাদের সঙ্গে থাকি তাদের ছেঁড়া চাটাই, মাটির হাঁড়ি ছাড়া আর কিছুই

নেই। আমরা একবেলা খাই, দিনের বেলা একটা মাঝামাঝি সময়ে, যাতে সারাদিন আর ক্ষিদে না পায়। ভাত আর পাটশাক পুরো দেড় মাস খেলাম। এখন একটা রাস্তার টেস্ট রিলিফের কাজ হচ্ছে। সন্ধেবেলা আটার গোলা খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি।'

আমার মনের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিবাদ তালগোল পাকিয়ে ওঠে, 'তাহলে কি কৃষিবিপ্লবের কথাটাই আগাগোড়া মিথ্যে! এমন কি খবরের কাগজে জোতদার মারার রিপোর্ট বেরোচ্ছে সেগুলোও উড়ো খবর?'

সোনা একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'উড়ো খবর হতে যাবে কেন? সেরকম ঘটনা তো ঘটছেই। কিন্তু সেগুলো তো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আগে কী হোত? জোতদারদের গুণ্ডাদের সঙ্গে গাঁয়ের গরীব চাষীদের একটা লড়াই হোল। তারপর গাঁয়ে পুলিশ এল। ঘরে ঘরে সন্ত্রাস চলল। নেতারা তার আগেই সটকেছেন। তাই শেষপর্যন্ত এক তরফা নির্যাতনে জেলে চাষীদের মনোবল তছনছ হয়ে যাবার পর নেতারা আত্মসমালোচনায় বসলেন। এই ব্যাপার বারে বারে ঘটেনি?'

'তাহলে আপনারা কী করছেন? আপনারা কি সেই পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি করছেন না!'

'না আমরা পুনরাবৃত্তি করছি না। আমরা জয়ের সূচনা ঘটাচ্ছি। মাসখানেক আগে আমাদের ওখানে অ্যাকশান হয়েছে। পুলিশ এসেছিল, আমি তখন ক্ষেতে মই দিচ্ছিলাম। একেবারে টের পায় নি। আমাদের আন্দোলন যদি ঠিক এইভাবে চালাতে পারি, কখনও টের পাবে না।'

এবার জোরালো বোমার আওয়াজ আসতে থাকে পরপর। আমরা দুজনে চুপ করে থাকি। আমার মনে কতগুলো প্রশ্ন মাথা তুলে মিলিয়ে যায়। সমস্ত প্রশ্নের সমস্ত সমাধান একটা লোকের কাছ থেকে আশা করা অন্যায়।

'খুব ভোরে বেরিয়ে যাব। গাঁয়ে থাকতে থাকতে ঘুমের অভ্যেস বেড়ে গেছে। সন্ধে হতে না হতেই তো চারদিক অন্ধকার। আর সারা দুপুর রোদ আর জল গায়ে নিয়ে হাল দিয়ে সন্ধেবেলা মাজা ভেঙে যাবার

জোগাড়, চোখের পাতা জুড়ে আসে। দেড়মাস অপেক্ষা করতে হোল শুধুমাত্র কথা বলবার জন্যে, যে কথাটা খাওয়া, জমিতে হাল দেওয়া থেকে আলাদা। তারপর অবশ্য কথাটা আস্তে আস্তে পাতা ছাড়ে। আরও মাসদেড়েক যায় এ অঞ্চলের গরীব চাষীদের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়তে। যে লোকটার হাতে আইন আদালত পুলিশ রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত কটা চাবি, যে-কোন পরিবর্তনকেই যে সে নিজের মতো ব্যবহার করতে জানে, সে ভেবেছিল এবারও পার পাবে, কিন্তু পায়নি। আসল কথা কি জানেন, গরীব চাষীর সঙ্গে একাত্ম হওয়া। সহরে বিরাট জমায়েত করে, খবরের কাগজে ফলাও করে লিখে, গরম গরম কথা হাঁকড়িয়ে একাত্ম হওয়া যায় না। এই অপরিসীম দারিদ্র্য অনাহার, অভাববোধের প্রকাণ্ড অভাবের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে যদি আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, যদি আমরা নামের লোভে, চমকপ্রদ কিছু করার তাড়নায় হটে না আসি, তাহলেই গ্রামের চেহারা, দেশের চেহারা পাল্টাবে। নইলে গ্রাম থাকবে শহরে মানুষের ক্যামেরার গ্রাম অথবা বক্তৃতার গ্রাম হয়ে।'

নড়ে চড়ে বসে বলে, 'আমিও বক্তৃতা দিচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এগুলো আসলে আমার স্বগতোক্তি, নিজেই নিজেকে বলছি' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আমার খালি ভয়, ঘটনার গতি হয়ত পাল্টে যেতে পারে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী? পাল্টে যাবে কেন?'

'পাল্টে যাবে বলছি না, পাল্টে যেতে পারে।' সোনা চুপ করে থাকে। আমি আর প্রশ্ন করতে সাহস পাই না। কারণ সত্যিই যদি স্বগতোক্তিই হয় তাহলে আমার প্রবেশ তো সেখানে অনধিকার চর্চা।

'আপনার সঙ্গে হয়তো আর আমার দেখা হবে না।' আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে সোনা। আমি জড়ভরতের মতো বসে থাকি। অপেক্ষা করি, খুব ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলি পাছে কথায় বিঘ্ন ঘটে। 'আমি আপাতত গ্রামেই থাকছি। শহরে নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে। আমাদের এখানেও কিছুদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। অনেক

জিনিষ ঘটবে যার সঙ্গে হয়ত কৃষিবিপ্লব মেলাতে পারবেন না, অন্তত আমি পারছি না। এ কথাটা এমন প্রকাশ্যে কাউকে বলিনি। বলায় বিপদ আছে বলে নয়, বলার নিরর্থকতার জন্যে। এখন এমন পর্যায়ে আন্দোলন উঠছে যে সত্যি হলেও কোন সমালোচনা একেবারে অগ্রাহ্য। যদি দেখি ফেরার রাস্তা নেই, গ্রামেই থেকে যাব।···মা-র সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করবেন, অবশ্য নিজেকে বাঁচিয়ে। যা বিশ্বাস করেন না তার মধ্যে যাবেন না। আপনাকে আমার শুধু এইটাই বলার কথা। যদি মনে করেন, আমাদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আপনার গত্যন্তর নেই, তাহলেই ঝাঁপাবেন। নইলে নয়।···অনেক রাত হোল শুয়ে পড়ি।'

খুব ভোরেই আমার ঘুম ভাঙে। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থাতেই কার হাতের চাপ আমার হাতের আঙ্গুলে পাই। চোখ খুলতেই দেখি সোনা নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে।

৯

পরদিন কারখানা থেকে একটু দেরীতে ফিরেছিলাম। বাবার গলা পেয়ে দরজার বাহিরে থমকে দাঁড়াই, 'গোনুর একটা বিয়ের সম্বন্ধ এনেছি। আমার বন্ধু বীজেশের মেয়ে। ওরা দুই বোন। বীজেশের কাঠের ভাল কারবার, দুটো পেট্রোল পাম্প, গ্রে ষ্ট্রীটে পৈতৃক বাড়ি। সল্ট লেকে জমি কিনেছে। মেয়েটা কিছু আহা মরি দেখতে নয়। তবে সবকিছু তো আর একসঙ্গে হয় না।'

ওদিক থেকে কোন উত্তর আসে না।

'কী? জবাব দিচ্ছো না যে। আমি তোমার মনের কথাটা টের পেয়েছি। তুমি চাও না তোমাব ছেলে বিয়ে-থাওয়া করে আর পাঁচটা ছেলের মতো ঘরসংসার করে। সে তোমাকে নিয়ে আর তোমার সমস্যা নিয়ে মাথা চাপড়ায় আর সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়, এই চাও। কী? ঠিক বলি নি?'

'তুমি এখানে আসো, খালি আমাকে কষ্ট দিতে।' মা-র কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর এল। 'এখনই গোনু এসে পড়বে। তুমি ওর সঙ্গেই কথা বোল। ছেলেরা বড় হলে সোজাসুজি কথা বলাই ভাল।'

আমি ঘরে ঢুকেই বাবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। 'তোমার বন্ধুর মেয়েকে আমি বিয়ে করছি না বাবা। আমার পাত্রী স্থির আছে।'

মা হতভম্বের মতো আমার দিকে চেয়ে থাকেন। বাবা উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'বাঃ, তাহলে তো কথাই নেই। তোমরা আজকাল বড় হয়েছো। নিজেরা দেখেশুনে বিয়ে করাই ভাল।...সঙ্গে সঙ্গে তোর এই কারখানার পচা চাকরীটায় ইস্তফা দে। আমি একটা প্লাইউডের কারখানা বসাচ্ছি। তোকে ম্যানেজার করব।'

আমি ঘরের কোণ থেকে মোড়া টেনে বসে বললাম, 'আমার কোনটাই তোমার মনঃপূত হবে না। যাকে বিয়ে করছি তার বাবার টাকা নেই, বাড়ি নেই। আর চাকরীটা ছাড়বারও কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

বাবার হাতে দুটো মোটা কালো বই, বোধহয় আইনের। বাবা সে দুটো আস্তে আস্তে তক্তাপোষের ওপর রেখে বললেন, 'আমি সূর্য ব্যানার্জিকে বুঝি, কিন্তু তোকে বুঝি না।'

আমি চমকে উঠে তাকাই বাবার দিকে। বাবা বলেন, 'হ্যাঁ সূর্য ব্যানার্জিকে বুঝি। সে তার চাকরি বাড়ি-ঘরদোর ছেড়ে কৃষিবিপ্লব করে বেড়াচ্ছে, ভাইগুলোকে ঠেলে দিয়েছে জেলে। আমার কাছে অসম্ভব কিছু লাগে না। স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশের অনেক ছেলেরা গুলি খেয়েছে, স্বাধীনতার পরেও খাচ্ছে। কিন্তু যারা এ পথে গিয়েছে তারা জেনেশুনেই গিয়েছে। কিন্তু তুই? তুই কী করছিস? তুই রট করছিস!'

আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না তোমার। বাড়ি যাও, বাড়ি যাও বলছি!' উত্তেজনায় আমি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম।

ঠিক এই সময়ই একটা কাণ্ড হয়। মা হঠাৎ দড়াম করে পড়ে যান। বাবা আমি দুজনেই ছুটে যাই। ধরাধরি করে খাটের ওপর শুইয়ে দিই। মা যেন ঘুমের মধ্যে থেকে কথা বলেন, 'আমি পা তুলতে পারছি না, হাত তুলতে পারছি না।'

'আমি ডাক্তার ডেকে দিচ্ছি', বলে বাবা বেরিয়ে যান। একটুক্ষণ পরেই মা জ্ঞান হারান। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকি কিন্তু ডাক্তার আসে না, মা-ও তেমনি সংজ্ঞাহীন। আমি বিনতাদের বাড়ি যাই। কান্তিবাবু সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন। কান্তিবাবু আমার থেকে শরীরতত্ত্ব ব্যাপারে অভিজ্ঞ। বললেন, 'আমার এক কাকার এমনি হয়েছিল। আমি এখনই গাড়ি বের করছি। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

সে রাত্তিরে কান্তিবাবু সঙ্গে না থাকলে সত্যিই বিপদে পড়তাম। কারণ দুজনে মিলে মা-কে ট্যাক্সিতে তুলে হাসপাতালে পৌঁছিয়ে এমার্জেন্সিতে জায়গার অভাবে মেঝেতে ফেলে রাখা ছাড়া আর কিছুই আমার পক্ষে গত্যন্তর ছিল না। কান্তিবাবু কিন্তু হাঁকডাক লাগিয়ে দিলেন এবং হাঁকডাকে কাজ হোল। রাত দুটোয় হাসপাতালে ডাক্তার

এলেন, একটা ইঞ্জেকশান পড়ল। পরদিন সন্ধেবেলা মা-র চৈতন্য ফিরল। আমি পরদিন কারখানায় যাইনি। পাশেই ছিলাম। মা আমার হাত চেপে ধরে প্রথমেই বললেন, 'তুই আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছিস গোনু? আমার আর কেউ রইল না।'

আমি মাকে সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু মা নীরবে মাথা ঝাঁকালেন।

ডাক্তারিতে মাঝে মাঝে অঘটন ঘটে যায়। বোধহয়, সময়মত ঠিক ইঞ্জেকশানটা পড়ার দরুণই অথবা স্পেশাল কেস বলে এক তরুণ এফ-আর-সি-এস ডাক্তারের বিশেষ চেষ্টাতেই মা সে যাত্রা বাঁচলেন। তিনরকম অসুখের কথা শুনলাম এক্ষেত্রে—পোলিওমেলাইটিস, কার্ডিয়াক এবং নিউরালজিক। পরদিন থেকেই আস্তে আস্তে বাঁদিকের অসাড় পা ও হাত নাড়াতে শুরু করলেন। পাঁচ ছদিন পর হাসপাতালের ঘরের মধ্যে উঠে চলে বেড়ালেন।

সেই তরুণ ডাক্তারটির কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ হয়ে পড়লাম, বাস্তবিক তাঁর এত কাজের চাপ এবং আমার আর্থিক সামর্থ এত কম তা সত্ত্বেও তিনি প্রায় অবশ্যম্ভাবী এবং বোধহয় অনিবর্তনীয় ঔদাসীন্যের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে এতখানি কেন করলেন তা বুঝি নি। বেশ কিছুদিন পর জানতে পেরেছিলাম। এখানেও সূর্য ব্যানার্জির হাত প্রসারিত হয়েছিল।

হাসপাতালে মায়ের কতগুলো হাত ও পায়ের ব্যায়াম করানো হোত। এগুলোর ভার আমিই নিলাম কারণ বাড়িতে নার্স ডাকার সঙ্গতি আমার নেই। আমার রুটিন আবার সম্পূর্ণ মাতৃকেন্দ্রিকরূপে দাঁড়িয়ে গেল। কারণ মায়ের একটা ক্রমশ ধারণা জন্মাচ্ছিল যে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য। এর মূলে আছে হয়ত বাবার কাছে আমার সহসা বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ। মা কিন্তু সোজাসুজি একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি এ প্রসঙ্গে। খালি বার বার হাতের ব্যথাটা বেড়ে গেলে কাতরেছেন, 'তুই আমাকে ছেড়ে যাবি গোনু। সবাই গেল। তুইও যাবি।'

মানুষের এক অদ্ভুত দ্বৈতরূপ আমার সামনে হাজির হয়েছিল।

একদিকে মানুষ আত্মবিসর্জনের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, সামান্য স্বার্থের দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, তার ব্যক্তিগত আবেগ ইচ্ছা অনুপস্থিত, সে কেবল এক নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসের ধারক। আবার এই মানুষই কী অসম্ভব ভঙ্গুর, কী দারুণ স্নেহকাতর, কী অদ্ভুত স্পর্শপ্রবণ, সর্বক্ষণ সে কেবল আত্মচিন্তাতে এমনভাবে মগ্ন যে বাহিরের সামান্য আলো হাওয়াও সে চিন্তার দেয়ালে প্রতিহত।

প্রায় দশবারো দিন বিনতার কাছে যেতে পারিনি। হাসপাতালের মেঝেতে মা যখন পড়েছিলেন তখন মনে হয়েছিল তাঁর মৃত্যু আসন্ন। আর মায়ের বিদায়ের ক্ষণ আমি মনে মনে তৈরী করে প্রবল শোকে অভিভূত হয়েছিলাম। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যে আমার বাল্য কৈশোর যৌবনের স্মৃতি, তার জন্মমৃত্যুও যেন আমার চোখের সামনে ভাসতে আরম্ভ করল। আর এই চিন্তাভাবনায় এমন স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে যে সেখানে বিনতার প্রবেশ নিষেধ। আর বেশী দিন চললে হয়তো বিনতার প্রতি আমার আকর্ষণ ফিকে হয়ে যেত। কান্তিবাবু বার দুই মাকে দেখতে এসেছিলেন। একদিন তার সঙ্গে বিনতাও ছিল। মা তাঁর দিকে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। আমি স্বাভাবিক সৌজন্য দেখিয়েছিলাম। আমি বলতে-কি অবাকই হয়েছিলাম নিজের আচরণে।

ইতিমধ্যে পোচখানেওয়ালা আমাকে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন তাঁর কোয়ার্টারে। খুব ফ্যাকৃফ্যাকে ফর্সা তরুণী ভার্যাটি ঠোঁটে ডগডগে লাল লিপস্টিক আর উরু-দেখানো স্কার্ট পরে আমাকে আপ্যায়ন করলেন।

'মিস্টার মিটার, হোয়াই ডু দ্য বেঙ্গলীজ বিকাম সো ভায়োলেণ্ট ?'

কফি ও কাজুবাদাম সদ্ব্যবহার করতে করতে 'অবজেকটিভ কণ্ডিশান্স' প্রভৃতি কথা সুরু করতেই তিনি সাদা ঝকমকে বিজ্ঞাপনসদৃশ হাসি দেখিয়ে বললেন, 'ডোণ্ট বি সিলি। কণ্ডিশান্স খারাপ বলেই বোমা ছুঁড়বার কোন যৌক্তিকতা নেই।'

পোচখানেওয়ালা বললেন যে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমি পেরে উঠব না। লরেটোতে পড়ত ও ডিবেট করত। এখন বম্বের কোন ফ্যাশান কাগজে

ফিচার লেখে।

তারপর আমরা সাপের আলোচনায় যাই। তরুণীটি বাল্যকাল কাটিয়েছেন বার্মাতে। সাপ কেমন করে রাঁধা হয় তার বর্ণনা দিলেন। 'ইট ইজ ডেলিশাস্। আই মিন ইট।'

তাঁর বাড়ির দরজায় আমার সঙ্গে এসে সাহেব প্রস্তাবটা করলেন। বললেন, 'সূর্যর পোস্টটা কী হবে? তুমি যদি ওটা অ্যাক্সেপ্ট না করো, তাহলে আমার ক্লোরিন ডিপার্টমেণ্ট থেকে লোক আনতে হবে। তাতে ব্যাড ব্লাড তৈরী হবার সম্ভাবনা আছে।'

আমি সেদিন বললাম, 'আমি ভেবে দেখব।'

চাকরির জগতে একটা নিজস্ব লজিক আছে, এ কথাটা আমি কিছুদিন হল ক্রমশই টের পাচ্ছিলাম। এ জগতে এক জায়গায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকে না। যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, আসলে সে নীচের দিকে চলে যায়, কিছুদিন পর সে কেবল ভালমানুষ বা অনুকম্পার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তার হাঁকডাক হয়তো আগের মতই থাকে, মাইনেও কাটা যায় না, কিন্তু তাকে ঘিরে অফিসের গুঞ্জন আর ওঠে না। তার গতিবিধি আর লক্ষণীয় হয় না। এই বোধগুলো সম্বন্ধে আমাদের থেকেও তরুণতর কর্মীরা আরও সজাগ। এদের মধ্যে ক্লোরিন ডিপার্টমেণ্টের দুটি তরুণ আমার সোজাসুজি প্রতিদ্বন্দ্বী। ছেলে দুটি দিল্লীর বাঙালী। আমাদের ওখানকার ইউনিটে কয়েকমাস ঢুকেই ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে। ভাবী সমাজ গঠন অথবা কমিউনিস্ট পার্টির পথ কী হবে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তার অবকাশ নেই তাদের। তার মানে তারা এইসব কথাবার্তা থেকে সরে দাঁড়ায় তা নয়, বরঞ্চ তুখোড় মন্তব্য করে। কারণ সবই তাদের টকিং পয়েণ্ট। মাত্র তিন-চার বছরের চাকরির মধ্যেই এ দুটি তরুণের সঙ্গে পোচখানেওয়ালার এবং অন্য ডিপার্টমেণ্টের সাহেবদের হৃদ্যতা অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু লেগেছে। একমাত্র সূর্যকে তারা সমীহ করত, বোধহয় কিছুটা ভয়ও পেত। আমাদের অফিসে ব্যক্তিগত আবেদনের যে রাস্তা তা ডিপার্টমেণ্টাল-হেড-এর বাড়ির গা

দিয়ে কিন্তু এঁদের আবেদন বড়সাহেবদের কাছে সরাসরি। উত্তর ভারতীয় সম্পর্কের বাঙালী তরুণ বোধহয় সাহেবদের কাছে আরও নির্ভরযোগ্য। কাজেই সেদিন ক্লোরিন ডিপার্টমেণ্ট থেকে লোক আনার কথায় আমার মন কিছুটা দমে গিয়েছিল।

পোচখানেওয়ালা সুন্দর ফাঁদ পেতেছেন। রাবার কেমিক্যাল ও ক্লোরিনের ইউনিট দুটো এক করে একটা ইউনিট করেছেন। সূর্য থাকলে সেই এর সীনিয়ার পোস্টে আসত। তার অবর্তমানে তাই আমার প্রসঙ্গ উঠছে। কিন্তু আমার অসম্মতিতে কিছু আসছে-যাচ্ছে না, একথাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ ক্লোরিন থেকে দুটির মধ্যে একটি তরুণ আসবে আমাদের বস্ হয়ে।

তিন-চার দিন আমি খুব ভাবিত হয়ে পড়লাম। বাড়িতেও অন্যমনস্ক থাকতাম। বিনতার সঙ্গে দেখাও বন্ধ। চারপাশের জগতটা সর্বক্ষণ কেন চ্যালেঞ্জের মতো বারেবারে এবং এত ঘনঘন এসে হাজির হচ্ছে ভেবে বিরক্তবোধ করছিলাম। একবার ভাবলাম, আমি কি সেই সাবেকী মধ্যবিত্ত মানসিকতার শিকার হচ্ছি না—সেই একান্ত দিকভ্রান্ত কেরীয়ারবোধে বিপর্যস্ত হচ্ছি না? নইলে আমার উপরওয়ালা কে এল গেল এতে আমার কী আসে যায়? কী এসে যায় দিল্লী ফেরতা দুটি বঙ্গসন্তান পোচখানেওয়ালার সঙ্গে কতখানি দহরম মহরম করছে সে ব্যাপারে স্পর্শকাতর হয়ে। তারা অফিসের ক্রিকেট ক্লাবে যোগ দিয়ে চমৎকার ব্যাট আর স্পিন্ বল করে অন্যান্য বিভাগীয় কর্তাদেরও নজরে এসেছে, তাতে আমার কী এসে যায়? আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, এভাবে থাকতে পারি না?

পরক্ষণেই আমার অফিসের অভিজ্ঞতা আমাকে বলে দিল যে, সাতেও নেই পাঁচেও নেই এভাবে থাকা যায় না। মানুষের সবচেয়ে অসুবিধে তার উপস্থিতি নিয়ে যদি কেউ কথা না বলে, কেউ ভাবিত না হয়। মানুষ সবসময় তার অস্তিত্ব জানান দেবার জন্যে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অবিরত চেষ্টা চালায়, তার অফিসে তার পরিবারে তার বন্ধুমহলে। যদি

তার সম্পর্কে বিরুদ্ধ কথাও কেউ বলে তাও তার পক্ষে আখেরে লাভ। কাজেই ওভাবে জড়দগব হয়ে অফিসে চাকরী করা যায় না। তাছাড়া উত্তর ভারতীয় এক সংক্রামক চ্যাংড়ামির আমি ভয়ানক বিরোধী। ইংরেজী বলায় অ্যাকসেন্ট দেবার করুণ চেষ্টা, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে রিজিওনাল আখ্যা দিয়ে, এক সর্বভারতীয় বায়বীয় আসলে আমেরিকান ব্যক্তিত্ব অর্জনের হাস্যকর চেষ্টাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করেছি। এই দুটি তরুণ করিতকর্মা কেরীয়ার-পিপাসু ব্যক্তিত্বকেও আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতাম। তাদের একজনকে আমার মাথার ওপরে বসিয়ে দিলে আমার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। আমি কেরীয়ার-পাগল নই কিন্তু আমি বাউল বৈরাগীও নই।

তাছাড়া সূর্য ব্যানার্জি তো পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমি তাদের আন্দোলনে ঝাঁপাতে পারি কেবল একটা সর্তে, যদি আমার তাতে আন্তরিক সায় থাকে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততো বুঝতে পারছি আমার মানসিকতা সেভাবে তৈরী নয়। আমি আরুর মতো, উপির মতো অকুতোভয় কিংবা মৃত্যুঞ্জয়ী নই। মৃত্যুকে আমি ভয় করি। আমি জানি, মৃত্যু কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী জেনে তাকে বরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু চারপাশে যা ঘটছে তা কি অনেকটা আত্মহননের পথ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না?

আর সূর্য ব্যানার্জির যে কৃষিবিপ্লব তার অসামান্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার নৈর্ব্যক্তিক রূপ আমার কাছে আরাধ্য কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে আমি ক্ষুদ্র, অত্যন্ত সীমিত আমার সাহস। অনেকে চললে আমি তাদের সঙ্গে চলতে পারি, কারণ চারপাশের চলার শব্দ, আমার সাথীদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আমাকে চলতে সাহায্য করে। কিন্তু যদি পেছনে তাকিয়ে দেখি আমার পেছনে কেউ নেই, আমি সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ব। সূর্যের ক্ষেত্রে তা হবে না। আমি নিশ্চিত জানি সূর্য একা একা হেঁটে যাবে।

চার পাঁচ দিন পর সম্মতি জানিয়ে ফোন করায় পোচখানেওয়ালা বললে 'আই নিউ। ইউ উড্ নট ফেল মি।'

পরের সন্ধ্যায় বিনতার বাড়ি গেলাম। ঠিক কেষ্ট ঠাকুরের মতো পেছন থেকে এসে তার চোখ টিপে ধরলাম। বিনতা শক্ত হাতে আমার ডান হাতখানা চেপে ধরে এক ঝটকায় সরে দাঁড়াল। তার পাতলা শরীরে যে বেশ জোর রাখে সেদিন প্রমাণ পেলাম। রাগে চেঁচিয়ে উঠল বিনতা, 'আমি কি আপনার খেলার পুতুল? খেলতে এসেছেন? যান না, বাজারের মেয়েদের কাছে, ভাল খেলাবে।'

আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কমবয়সী মেয়েদের মুখ থেকে এরকম চোয়াড়ে কথা আগে কখনও শুনি নি।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে বিনতা? মা-র অসুখ, তাই···'

'মিথ্যে কথা বলবেন না। পনেরো দিন হোল একবারও ফুরসত পান নি। কী দরকার? আমি তো আঁচল বিছিয়েই আছি। যখন সুবিধে হবে বাবু আসবেন।'

বিনতার বুকে যে এক আগ্নেয়গিরি আছে এবং সেই আগ্নেয়গিরির সঙ্গে সারাজীবন সহবাস করতে হবে ভেবে আমার বুক দমে গেলেও তার রাগের যথেষ্ট কারণ আছে তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি। আমার প্রতি তার টানের জন্যেই সে রেগেছে, শুধু সৌজন্যের সম্পর্কে এরকম পরিস্থিতি নিশ্চয় সৃষ্টি হয় না।

'চা খাবেন?' রেগে রেগে জিজ্ঞাসা করে বিনতা।

আমি হেসে ফেলি। 'চায়ের সঙ্গে টা-ও খাব।'

চা আর ডিম ভাজা খেতে খেতে আমরা আবার দিন পনেরো আগের বন্ধুত্বে ফিরে যাই।

বিনতা আমার পাশে বসে পা নাচায়, মাথা দোলায়।

'আমার কেমন ভয় হচ্ছিল জানেন, আপনি হয়তো আসবেন না।··· আর আমি তখন কী করব? আমার মামাতো বোনের হয়েছিল।'

'কী হয়েছিল?'

'আমার মামাতো বোন আমার মতো না। আপনি দেখলেই নিশ্চয় প্রেমে পড়তেন। লেডীব্রাবোর্ণে পড়াত। জি-ই-সি-র এক ছোকরা

অফিসারের সঙ্গে খুব ভাব হোল। পার্ক ষ্ট্রীটে সন্ধের পর খেতে যেত। খুব ঘোরাঘুরি করল এক বছর তারপর একদিন স্লিপিং পিল খেয়ে মরে গেল।'

বিনতার কথাগুলো সেদিন আমাকে স্পর্শ করেছিল। সূর্যের যে বক্তব্য মেয়েদের অসহায়তা সম্পর্কে এত দাপানি ঝাপানি সত্ত্বেও তার প্রতিমূর্তি বিনতা। বিনতার এই গল্পের উল্লেখও আমার কাছে করুণ লাগে। আমি এক নতুন ধরনের মমত্ব বোধ করি।

'আচ্ছা…' বিনতা মাথা হেঁট করে থাকে।

'কিছু বলছো?'

বিনতা চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। একবার ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে।

'বলো না, কি বলছো?'

'বাবাকে কী বলব?'

আমার দিকে তার সমস্ত মুখখানা তুলে সে অপেক্ষা করে। আমি অনেকদিন পরও ভেবেছিলাম কেন বিনতার এই প্রশ্ন একটা ঘণ্টার মতো আমার বুকের মধ্যে বেজে উঠেছিল। বলতে কি সে বাজনা এখনও থামে নি।

আমি বললাম, 'বাবাকে আমিই বলব, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

ট্যাক্সি গ্যারাজ করার শব্দ এল। 'আজ আমি চলি। কাল তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব।'

বিনতার সমস্ত মুখখানা চাপা আনন্দে ঝলমল করে।

বাড়িতে ঢুকতে না-ঢুকতেই মা হাতের ব্যথায় গোঙাতে থাকেন। বলেন, 'আর তো কটা দিন আমার! এই কটা দিন আমার কাছে একটু থাক না। আমি চলে গেলে এরকম করে কেউ বলবে না।'

আমি বললাম, 'তোমাকে নিয়েই তো অষ্টপ্রহর আছি। ছুটির দিনে

বাড়িতে বন্ধ হয়ে বসে থাকি। সন্ধেবেলা বেরোব না? আমাদের বয়সের ছেলেরা ক্লাব করছে, পার্টি করছে। আমার নিজের জীবন বলে কি একটা কিছু নেই?'

সেদিন রাতে মায়ের ব্যথাটা পা থেকে ওপরের দিকে উঠে আসতে থাকে। মড়ার মতো পড়ে থাকেন। আমার ভাল ঘুম হয় না রাত্তিরে। এক একবার অন্ধকার ঘরে উঠে গিয়ে দেখি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ঠিক পড়ছে কিনা। মা কথা বলেন না কিন্তু বুঝতে পারি যন্ত্রণা পাচ্ছেন।

পরদিন সকালে ফ্যাক্টরিতে ঢুকবার মুখে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আরামে চোখ বুঁজে এল।

মানিক দাস উঠে এসে বললে, 'আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? ঘুম হয়নি রাত্তিরে?'

মায়ের অসুস্থতার কথা বলাতে বলল, 'আমাকে বলেন নি কেন আগে? কোন স্পেশালিস্ট দেখাতে চান?'

আমি কলকাতার এক বিখ্যাত হার্ট-স্পেশালিস্টের কথা বললাম। সামনের রোববারে বিনতার বাবার ট্যাক্সিতে কলকাতার এক সাহেব পাড়ায় তাঁর চেম্বারে নিয়ে যাব ভাবছিলাম।

'রোববার তো অনেকদূর। আপনি কিছু ভাববেন না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

সেদিনই রাত নটায় একটা নতুন গাড়ির তীব্র হেডলাইটে আমাদের গলি আলোকিত হয়। আমি ভাবলাম, কোন লরী ঢুকছে আমাদের গলিতে। বাহিরে বেরোতেই দেখলাম, সাদা ধবধবে বুশশার্ট ট্রাউজার্স পরা এক পাতলা ভদ্রলোক ভয়চকিত চোখে আমাদের বাড়ির আলকাতরা রঞ্জিত দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন। হেডলাইট তখনও জ্বালানো, তাতে ঝকঝক করে আলকাতরার আঁচড়ঃ 'জয় আমাদের হবেই কারণ চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।' পেছনে ইলেকট্রো-কার্ডিয়োগ্রাম যন্ত্র হাতে একজন বেয়ারা, সবশেষে মানিক দাস।

মানিক দাসের হঠকারিতায় আমি বেকুব বনে যাই। এত রাতে

বড় স্পেশালিস্টের কলকাতা থেকে শহরতলী আগমনের দাম ন্যূনতম চৌষট্টি টাকা না হয়ে যায় না। আমি মানিক দাসকে থাকতে বলে এক ছুটে বিনতার বাবার কাছ থেকে চল্লিশটা টাকা নিয়ে আসি। আমার কাছে যা ছিল তা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে চৌষট্টি টাকার নোটগুলো প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখি।

ডাক্তারটি বেশ যত্ন করেই মা-কে দেখেন। বলেন, 'আপনি এ নিয়ে একদম ভাববেন না। আপনার যা অসুখ তা নিয়ে কেউ কেউ দশ-বারোটা মিটিং করছে দিনে। কেউ বারো-চোদ্দ ঘণ্টা খাটছে। কোন ব্যাপারে কোন উদ্বেগ রাখবেন না। বেশ রিল্যাক্সডভাবে থাকবেন। নুনটা আর ঘি বনস্পতিটা বাদ। সকালে আপেল সেদ্ধ। আর মাংস খাবেন না। চিকেন চলতে পারে। ছোট মাছ আইডিয়াল।'

তারপর মেসিন বন্ধ করতে করতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'দিন পনেরো পর থেকে একটু একটু হাঁটাবেন মাকে। এই খোলা জায়গায়, আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা। পরে আরও বাড়িয়ে দেবেন।'

এতক্ষণ পর মা বললেন, 'কোথায় হাঁটব বাবা? সন্ধের পর দরজা জানলা বন্ধ করে থাকি, যা বোমার আওয়াজ চারপাশে সুরু হয়ে যায়।'

'ও তাও তো বটে!' ভদ্রলোক এতক্ষণে ঘরের চারদিকে চাইলেন। তিনি যেন প্রথম টের পেলেন শহরের নিরাপদ অঞ্চলে মারোয়াড়ী রুগীর বাড়ি এটা নয়।

বেরোবার মুখে নোটগুলো প্যান্টের পকেট থেকে মুঠি করে বার করে বলি, 'আপনার ফি-টা।'

'ষোল টাকা।' একনজর আমার হাতের দিকে চেয়ে বললেন।

তাঁর নীচু গলা আমি শুনতে পাই না। আর একবার প্রশ্ন করব কিনা ভাবছি। আমার বিহ্বল মুখের দিকের চেয়ে আস্তে আস্তে স্পেশালিস্ট বললেন, 'আমাকে ষোলটা টাকা দেবেন—ওষুধটা কাল সকাল থেকেই যেন পড়ে। অন্তত তিন চারমাস ওষুধ চলবে।'

বাহিরে বেরিয়ে এসে আবার ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'ভালই হয়েছে। আমাদের লাইনে তো অনেক কাটথ্রোট আছে।'

স্টার্ট দেবার সময় ডাক্তারের গলা পেলাম। সঙ্গীটিকে বললেন, 'বা[illegible]! যখন গলিতে গাড়ি ঢুকল ভাবতে পারি নি আবার বেরিয়ে আসব।'

মানিক দাস বললে, 'যখনই দরকার হবে আমাকে জানাবেন।'

তার গলার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আমাকে স্পর্শ করে। আমি তখনই বিনতাদের বাড়ি গিয়ে টাকাটা ফেরত দিয়ে এলাম।

'শুধু ভালবাসায় চিঁড়ে ভেজে না, ভালবাসা বাঁচিয়ে রাখতে সংগ্রাম করতে হয়।' সূর্য ব্যানার্জির কথার প্রতিধ্বনি আমি চারপাশে দেখি। উনিশশো সত্তর সালের গোড়ার দিকে কয়েকটা মাস আমি এক নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের শিখরে উঠেছিলাম। আমাদের অঞ্চলের ওয়াগনব্রেকারদের মধ্যমণি শ্যামল গাঙ্গুলী শুধু স্তব্ধ হয়নি সমাজের যেসব জীব আমাদের সমস্ত প্রগতির চেষ্টাকে থামিয়ে দেবার অবিরত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের কার্যকলাপও বন্ধ। শুধু হার্ট-স্পেশালিস্ট নয়, যারাই ফালতু টাকার ফানুস ওড়াচ্ছে তাদের সকলের মনেই এক চমৎকার আতঙ্ক সঞ্চারিত হয়েছিল। এ আতঙ্কের প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারত তীর্থ' কবিতা অনুকরণ করে জনৈক বিখ্যাত সর্বোদয় নেতা এক প্রেস-কন্‌ফারেন্সে ভাষণ দিয়েছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত আমি সেই খবরের কাগজের কাটিং রেখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের মাটিতে এমন একটা যাদু আছে যার জন্যে ধনতন্ত্রের যে লজিক তা কখনও অনিবার্য হয়ে ওঠে না, অর্থাৎ লাভের জন্যে নয়, জনসাধারণের সেবার জন্যে বণিক বাণিজ্য করে। ঠিক এই যুক্তি অবলম্বন করেই কি বলা যায় না, খিদে পেলেও ভারতবর্ষের মানুষ চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে না, কাম জাগলেও নারী সহবাসে প্রবৃত্ত হয় না, মদ খাবার ইচ্ছে থাকলেও ভাটিখানার দিকে পা বাড়ায় না?

আমরা যারা শহরতলীর ধুলো ধোঁয়া আর খোলা ড্রেনের গায়ে বাস করি তাদের কাছে নেতাদের এইসব বাণী কখনই পৌঁছায় নি। যতই বছর যাচ্ছে ততই জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠছে। কপটের কাপট্য বেড়েছে, যে কটা ধনী ছিল আমাদের অঞ্চলে তারা প্রায় সকলেই এক একটা সিনেমা হল তৈরী করে কিংবা মাঠের মধ্যে কোল্ড স্টোরেজ বানিয়ে আরও ধনী হবার প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে বর্তমানের আকর্ষণ প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনধারণের একমাত্র

সার্থকতা কেবল ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে।

এই পরিবেশে সূর্য ব্যানার্জিদের সব কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আবার আরম্ভ করার আন্দোলনে আমাদের অঞ্চলের তরুণ সমাজ মনপ্রাণে সাড়া দিয়েছিল। অন্তত কয়েকটা মাস আমাদের মনে ঘনঘটা করে নতুন মেঘ উঠেছিল। আমরা তার জলাদ্র দুন্দুভি শুনেছি আকাশে বাতাসে। এটা শুধু কবিতা নয়, অথবা যদি কবিতা হয় তাহলে এক আশ্চর্য পৌরাণিক সামাজিক কবিতা, আমাদের মহাভারতের মতো, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাস্তবের গভীর যোগাযোগ। ভারতবর্ষের মাটিতে কী যাদু আছে জানি না, অন্তত কলকাতার শহরতলীর মাটিতে এক ধরনের জীবের আনাগোনা আমরা বরাবর লক্ষ করে এসেছি। এরা সর্বস্তরে তাদের অক্টোপাসের শুঁড় চালিয়ে দিয়েছে। খবরের কাগজের অফিসে এদের অবারিত যাতায়াত, থানার ও-সির সঙ্গে এদের মৈত্রী, পাড়ার পূজো কমিটিতে এরা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী, স্কুল কমিটিগুলোও কার্যত এদের দখলে। এদের কোন রাজনৈতিক পার্টি নেই, এদের পার্টির নাম অপরচুনিস্ট পার্টি, যখন যে দল বা যে ব্যক্তি ক্ষমতার শিখরে, এরা তৎক্ষণাৎ তারই ল্যাঙবোট। এরা সর্ষের মধ্যে ভূত, এদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য দাপটে আমাদের জীবন ছিল অস্থির। সূর্য ব্যানার্জির হুকুম এই জীবদের কার্যকলাপ স্তব্ধ করে দিয়েছিল। যা আইন আদালত পারে নি, পুলিশ পারে নি, খবরের কাগজ রাষ্ট্রযন্ত্র যে ন্যায়-বিচারের জয়গানে মুখর অথচ যা রূপ দিতে ব্যর্থ, তা অন্তত কয়েকমাসের জন্যে সূর্য ব্যানার্জিরা পেয়েছিল।

এইসব সামাজিক রাজনৈতিক তত্ত্বকথায় পাঠক নিশ্চয় ভারাক্রান্ত-বোধ করছেন। তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন, এ বই পড়ার সামান্য বাধ্যবাধকতা নেই। আমি শুধু নিজের কাছে গত দু-তিন বছরের ঘটনাগুলো পরিষ্কার করে নিতে চাই। আমি মাস্টার নই, কোন নির্ভুল সমাজবাদী তত্ত্ব কারো মাথার ওপর চাপিয়ে প্রাজ্ঞের উল্লাস আমার শুধু সাজে না নয়, সেরকম চিন্তাভাবনা আমার জগতের বাহিরে। কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার, আমি বিনোদনী সাহিত্য রচনায় বসি নি। আমাকে ক্ষমা করবেন। তার জন্যে আমার পুনর্জন্ম প্রয়োজন। আর ধরাধামের আকর্ষণ আমার কাছে এমন প্রবল নয় যে, পুনর্জন্মের প্রার্থনা মনের মধ্যে সঙ্গোপনেও টিকে থাকবে। আমি শুধু কালের চেহারাটা তুলে ধরতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য ব্যানার্জি আমার জীবনে তার আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের মাধ্যমে যে সৌরজগত চোখের সামনে টেনে এনেছিল তার কিছুটা বিদ্যুচ্ছটা আমার লেখায় ধরে রাখতে চাই।

এ বিদ্যুচ্ছটা অবশ্য টেকে নি। এ বিদ্যুচ্ছটা মিলিয়ে গেছে গভীর তমিস্রায় এবং এই তমিস্রা থেকে আমি কবে মুক্ত হব জানি না। আমি প্রাজ্ঞ নই। কোনটা হঠকারিতা, কোনটা শোধনবাদ, কোনটা নির্ভেজাল বিপ্লব, কিংবা খাঁটি বিপ্লবে শতকরা কতখানি শোধনবাদ ও কতখানি হঠকারিতার সংমিশ্রণ প্রয়োজন, এগুলো বার করা অভ্রান্ত প্রাজ্ঞ লোকদের কাজ, যারা সব কিছু ঠিকমতো প্রমাণ করেই সন্তুষ্ট। আমার সন্তোষের প্রয়োজন নেই, আমি পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে আছি। তার জন্যে যদি অসন্তোষের আগুনে পুড়তে হয় তাতেও আমি গররাজি নই।

কয়েকমাস পর থেকেই ঘটনার গতি অন্য মোড় নিল। কৃষিবিপ্লবের চেহারাটা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগল শহরের আজগুবি অ্যাকশানে। এই অ্যাকশানে আমাদের অঞ্চলের প্রধান শিকার সূর্যের মায়ের স্কুল। দোতলা বাড়িটার সমস্ত দরজাজানলা থেকে একসঙ্গে লেলিহান শিখা উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্ধভস্মীভূত ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত করল। এবং 'পুলিশ মারো অস্ত্র কাড়ো' দেয়ালে দেয়ালে এই স্লোগান অনুসরণ করে আমাদের অঞ্চলের তরুণরা চরম নৃশংসতায় কতগুলি পুলিশ অফিসারকে হত্যা করলে। ছেলের সামনে বাপের, স্ত্রীর সামনে স্বামীর সেসব মৃত্যু প্রকাশ্য রাজপথে, দিনের আলোয়। কিন্তু লোকে টুঁ শব্দটি করলে না। যে আতঙ্কবোধ সীমাবদ্ধ ছিল সমাজবিরোধীদের জন্যে তা এখন এক প্রবল সার্বিক রূপ নেয়। এমন পরিব্যাপ্ত আতঙ্কের রূপ

আমি আগে কখনও দেখি নি, কারণ কে আততায়ী কে নয়, সে সম্পর্কে সমস্ত নিশ্চয়তা ধুয়ে মুছে গেল। আমি ছেলেবেলা থেকে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট এবং সূর্যের প্রেরণায় তার যে পরম মানবিক মূল্যবোধ তার প্রতি আমার আকর্ষণ তীব্রতর হয়েছিল। কিন্তু আমাদের অঞ্চলে যেসব ঘটনা ঘটতে থাকে সাম্যবাদের অগ্রপশ্চাৎ ইতিহাসে আমি সেরকম কোন নজির পাই নি। সূর্যের সঙ্গে সাক্ষাতের এক প্রবল ইচ্ছায় আমি অস্থির বোধ করি। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম সে এ তল্লাট ত্যাগ করেছে, এমনকি তার নেতৃত্বও বোধহয় আর নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত নয়।

সূর্যদের সঙ্গে আমার একমাত্র যোগাযোগ তার মায়ের স্কুলের তরুণী শিক্ষয়িত্রী। মাণিক দাসের ডেরায় যাতায়াত এখন বিপজ্জনক কারণ পুলিশী তৎপরতা প্রচণ্ড। নীচে একটা টায়ারের দোকানের ওপর গৌরীদের বাড়ি। আমাকে দেখে সে একটু অবাক হোল। আমি ভয়ে ভয়ে বিহ্বলতার কথা তাকে জানালাম, কিন্তু তা তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করল না। বারবার সে একটা কথাই বললে, 'বিপ্লব তো আর ড্রইংরুমে আলোচনা নয়।' মেয়েটি শুনেছি ভাল ছাত্রী ছিল। কোন আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমরেডের স্ত্রী। কমলারঙের শাড়ী পরা শক্ত মেয়েটি আমাকে তার আত্মপ্রত্যয়ে সাময়িকভাবে মুগ্ধ করলেও আমার বিমূঢ়তা বাড়ায়। তার সঙ্গে আলাপে আমার এই ধারণা হতে থাকে, হয় মেয়েটা পাগল অথবা আমি পাগল। দুজনেই একসঙ্গে দুটো সুস্থ মানুষ হতে পারি না। একটা ব্যাপারে খানিকটা সুরাহা হোল, সূর্য নয় উপমন্যু বা উপির সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার হতে পারে।

কয়েকদিন পর আমাদের এলাকার বাহিরে একটা বাড়িতে উপমন্যুর সঙ্গে দেখা হোল।

সামান্য দুচার কথা হতে না হতেই সে বললে, 'আপনাকে মন স্থির করতেই হবে, আপনি কোন দিকে যাবেন।'

'আমি তো তোমাদের দিকেই আছি বরাবর। তোমাদের দিকেই থাকতে চাই। সেই জন্যেই আমার কতগুলো প্রশ্ন আছে। তোমার

দাদা থাকলে তাকে করতাম।'

উপি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদার মতো কবিতা দিয়ে বিপ্লব হয় না।'

'তার মানে?'

'তার মানে আপনিও জানেন। কবিতার সময় অনেক পড়ে আছে। আগে আমরা রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করি তারপর।'

আমি অসহিষ্ণুভাবে বললাম, 'তোমার দাদা শুধু কবিতা করছে না। সে কৃষিবিপ্লব করছে। ভারতবর্ষের পক্ষে যা সবচেয়ে প্রয়োজন।'

উপির পেশীস্বচ্ছল চেহারাটা আগের থেকে শুকিয়েছে। আগেও দাদার চেয়ে তার কথায় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ বেশী ছিল, এখন আরও বেড়েছে। আমার দিকে ডান হাতখানা তুলে তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেটি বললে, 'দাদা কৃষিবিপ্লব করছে না, কৃষিবিপ্লবের নামে সে শোধনবাদের শিকার হয়েছে।'

আমার একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ গলার মধ্যে পাকিয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু আমার সেই ক্ষোভ আমি গিলে ফেলি। বললাম, 'দাদার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু এটা তোমরা কী করছো। অপরিচিত লোক পাড়ায় ঢুকলেই পুলিশের স্পাই বলে তার নালি কাটছো?'

তার কচি কিশোর মুখে চমৎকার হাসি ফুটে উঠল। বললে, 'আপনাদের কথা ভেবেই তো মাও সে তুং সেই চমৎকার কথাগুলো লিখেছিলেন।'

'কোন কথাগুলো?'

'বিপ্লব সূচীকর্ম নয়……'

'মাও সে তুং তো আরও বলেছেন, জলের মধ্যে মাছের মতো মিলিয়ে থাকতে হবে বিপ্লবীদের।'

উপি রেগে বললে, 'আপনাদের মতো শোধনবাদীদের মুখে মাও সে তুং সাজে না।'

আমি কিন্তু রাগি নি। সত্যিই আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি শোধনবাদী, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিকভাবে আমি বিপ্লবের চেহারাটা বুঝবার জন্যে

উদগ্রীব। আমার এই দ্বৈতসত্তা কিছু পরিমাণে সূর্যের কাছে স্পষ্ট, তার ভাইয়ের কাছে তা অস্পষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক।

উপি বললে, 'আপনি একথাটা কি একবারও চোখ খুলে দেখছেন না, আমাদের ছেলেরা লড়াইয়ে অকাতরে প্রাণ ঢেলে দিচ্ছে কিন্তু আরও নতুন নতুন ছেলে এগিয়ে আসছে। আরও নতুন নতুন অঞ্চলে আমাদের অ্যাকশান হচ্ছে। আপনাদের ভাড়াটে কাগজগুলো তার কোন খবর দেয়?'

একথাটা অবশ্য ঠিক। যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ সৈনিকের অগ্রসরের মতো এক-একটি তরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি তরুণ এগিয়ে আসছে। কিন্তু আরও একটা কথা আছে, যে কথাটা আমার কাছে ক্রমশ জোরাল হয়ে উঠছে, তারুণ্যই এই বিপ্লবের জোর, তারুণ্যই এই বিপ্লবের দুর্বলতা। তরুণদের চৌহদ্দীর বাহিরে যে অগণিত মেহনতী মানুষ তাদের মধ্যে এ বিপ্লবের প্রসার স্তব্ধ কেন? তাছাড়া এই নালিকাটা সন্ত্রাস সাধারণ মানুষকে শুধু সরিয়ে দিচ্ছে না, এক প্রবল রাজনীতি-বিমুখীনতা সঞ্চারিত করছে। সূর্য ব্যানার্জির নেতৃত্ব যতদিন এ অঞ্চলে কায়েম ছিল ততদিন এ অঞ্চলের চেহারা ছিল একরকম কিন্তু যতই উনিশশো সত্তর সাল ফুরিয়ে আসছে ততই এক দিশেহারা আতঙ্কে মানুষ নির্বাক। তা ছাড়া উপিদের হিংস্রতার সামনে এসেছে রাষ্ট্রযন্ত্রের অমানুষিক হিংস্রতা। সাধারণ রাজনৈতিক বন্দীদের যে সব অধিকার বছরের পর বছর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অর্জিত তা এখন সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। উপিদের দলের কারুর সঙ্গে সাধারণ মানবিক যোগাযোগও রাষ্ট্রের চোখে তুলনাহীন দেশদ্রোহিতা এবং এক তুলনাহীন হিংস্রতায় তা মোকাবিলা করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হয়েছে। দৈনিক কাগজগুলোয় আর কিছুই নেই, রিপোর্টাররা যেন শ্মশানের অফিসে বসে দৈনন্দিন শবের তালিকা লিখতে ব্যস্ত।

উপিকে অবশ্য কিছুই বলি নি। আমার বলার কোন অধিকার নেই। যারা মিছিলে থাকে তাদেরই মিছিল পরিচালনার ভার। রাজনৈতিক

ভাষ্যকারদের মতো জানলায় দাঁড়িয়ে তর্জনী শাসনের অর্বাচীনতা আমার নেই। এ আন্দোলন যদিও উত্তুঙ্গে, যদিও রোজ সংঘর্ষের খবরই প্রধান খবর, তবু এর কোণঠাসা হবার সম্ভাবনা নিয়ে একটা প্রবন্ধও ফেঁদে ফেলি। কিন্তু এ প্রবন্ধ কার জন্যে? নিশ্চয় যারা মিছিলের বাহিরে তাদের জন্যে নয়। এবং যারা এখন মিছিল পরিচালনা করছে আমাদের মতো বাহিরের লোকের অনধিকার চর্চায় তাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ আমি উপিকে চাই, কিন্তু আমাকে উপির কোন প্রয়োজন নেই। আমি এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলাম সূর্যের হঠাৎ আবির্ভাব হবে। তখন নিশ্চয় আমার মনের কুয়াশা কাটবে। কিন্তু সূর্যের আবির্ভাব হয় নি। কাজেই আমার মনের কুয়াশা গাঢ় থেকে গাঢ়তরই হল।

সেদিন আরও কিছুক্ষণ আলাপ হয়েছিল। সেই তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরের আত্মপ্রত্যয় ও অকুতোভয় আমাকে স্পর্শ করেছিল কিন্তু আমি তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারি নি। গ্রহণ করলেও আমি তাদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তাম না এটা নিশ্চিত, কারণ আমার জীবনের গতি অন্য খাতে বইছে এবং তা থেকে বিচ্যুত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাম্যবাদের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমার বন্ধু আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, সে শিক্ষা চারপাশের ঘটনাগুলো মেনে নিতে বাধা সৃষ্টি করে। রাজনীতি তো আমাদের জীবনেরই অংশ এবং তা আমাদের বিচার-বিবেচনা দিয়েই বুঝতে হবে। কিন্তু উপির সঙ্গে আলাপে মনে হচ্ছিল বিপ্লব কোন দৈবশক্তি যা বিচার করে বোঝা যায় না, বিশ্বাসের মাধ্যমেই যার একমাত্র উপলব্ধি। আমি মাও সে তুং-এর লেখা উল্লেখ করে যতবার বলতে চেষ্টা করেছিলাম, কোথাও এরকম সাংগঠনিক গুপ্তহত্যার কথা সেখানে বলা নেই, ততবার একই কথা বলা হতে লাগল বারে বারে পড়ার জন্য। অর্থাৎ রাজনীতি অনেকটা মন্ত্রের মতো, তার শাব্দিক অনুলিপি আমাদের ধর্তব্য নয়, তা কেবল জপ করে যেতে হবে। এ পদ্ধতি আমার এ কাহিনীর নায়ক, আমার বন্ধুর সম্পূর্ণ

বিপরীত। সূর্য ব্যানার্জি আমাদের সমস্ত ভাবনাচিন্তা খোলা আকাশের নীচে নিয়ে এসেছিল। তার ক্ষেত্রে মানুষ আর পার্টিম্যান, সাবেকী মানবতাবোধ ও সমাজবাদ এমন সম্পৃক্ত যে কখনও অসোয়াস্তি হয় নি। তার বক্তব্যে বিরোধী হলেও সে আমার, আশেপাশের অনেক মানুষের মন কেড়েছে।

আরেকটা ব্যাপারেও আমার মনে কিছুটা খটকা লাগে। রাজনৈতিক জগতে যারা জনসাধারণ, যারা উপির ভাষায় শ্রেণীঘৃণায় জ্বলছে, তারা কারা? আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় সুধীর মিস্ত্রির গ্যারাজে তেলকালি মাখা ছেলেগুলো, রোজ দেরী করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে লালপেড়ে শাড়িপরা যে মেয়েটা ঘামতে ঘামতে কলেজের দিকে ধাবমান —সে? গঙ্গার ধারে খাটালে গোয়ালারা? শীলেদের জীর্ণ প্রাসাদের বাসিন্দে রিফিউজি হকার পরিবার? গ্যারাজের পাশে সাইকেল মিস্ত্রি শরৎ? এরা সবাই প্রচণ্ড আতঙ্কিত। গ্যারাজ সাইকেলের দোকান বন্ধ থাকে বেশীর ভাগ দিন। বিকেল পড়ে আসতে না-আসতেই অফিস ফেরতা বাবুরা হনহনিয়ে বাড়ি ফেরে, রাস্তার ধারে কোন বাড়ির জানলাই খোলা থাকে না। মাঝে মাঝে লাশ পড়ে, কখনও পুলিশের, কখনও কোন পার্টির। আসলে মৃতদেহের পার্টি নেই।

আরও কয়েকটা মাস কাটে। অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। সূর্য ব্যানার্জির কোন সন্ধান নেই। ইতিমধ্যে উপি তার গুপ্ত ঘাঁটি থেকে ধরা পড়ে। আস্তে আস্তে এ অঞ্চলের সমস্ত ঘাঁটিগুলো পুলিশের করতলে আসতে থাকে। আরও স্কুল পোড়ে। ইতিমধ্যে নতুন বছরে নির্বাচনের শাঁখ বাজে। বোমার ধোঁয়ার মধ্যে পোস্টার পড়ে দেয়ালে। কেউ কেউ পোস্টার সাঁটতে গিয়ে প্রাণ হারায়। খুব ধীরে ধীরে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের মনে সঞ্চারিত হতে থাকে। মানুষ কতদিন তার পিঠে চোখ বেঁধে হাঁটবে? কতদিন দোকানপাট বন্ধ করে বসে থাকবে? কতদিন গাছ পাথরের মতো স্তম্ভিত নৈশব্দে চারপাশে ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকবে মাত্র?

আমার বিয়ের তিনসপ্তাহ বাকী। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় বিনতার আবির্ভাব। সেদিন ছুটির দিন। সকালে ভেতরের বারান্দায় এসে দেখি জলের অভাবে বাবার দেওয়া লিলিগাছের টবগুলো কাঠ হয়ে আছে। আমি জল দিচ্ছিলাম। অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে মা এসে বললেন, 'বিনতা এসেছে।'

আমি বাইরের ঘরে আসতেই দেখি উদ্বেগে আমশি হয়ে গেছে বিনতার মুখ। 'ছোটাইকে পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি একবার দেখো। ওকে নিশ্চয় মেরে ফেলেছে।' বিনতা ফুঁপিয়ে ওঠে। আমি কার্তিকের ক্যাবিনে গিয়ে শুনলাম, সমস্ত পাড়াই ব্যাপারটা জানে, কাল তাকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমার কিছু করণীয় নেই। করতে গেলে প্রাণহাণির সম্ভাবনা।

বিনতাকে গিয়ে বললাম সে কথা। বললাম, 'ছোটাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ বস্তির ভেতরে উপিদের ডেরার খবর যারা দিয়েছিল তাদের মধ্যে সে একজন।'

'তুমি এগুলো বিশ্বাস করো?' বিনতা চীৎকার করে উঠল।

আমিও উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি কিছু আসে যায়?'

'তোমার বন্ধুর দলই তো এসব করছে।'

আমি অসহিষ্ণুভাবে বললাম, 'আমার বন্ধুকে এর মধ্যে জড়িও না।'

'বাঃ! চমৎকার বলছো তুমি! একই পার্টির লোক, তাকে জড়াব না তবে তোমাকে জড়াব?'

বিরাট ভার নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। গতদিন স্টেশন থেকে কারখানা যাবার পথে বৃষ্টিতে ভিজে একশা হয়েছিলাম। সকাল থেকেই নাক টানছিল। বিকেল হতে না হতেই তেড়ে ফুঁড়ে জ্বর এল। আমি তখন কার্তিক ক্যাবিনে বসে চা খাচ্ছিলাম। পাড়াটা আজ দুপুর থেকেই থমথমে। কার্তিকের ছেলে বললে, 'তাড়াতাড়ি চুমুক দেন।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কেন তাড়া দিচ্ছিস রে?'

'আজ একটুক্ষণ পর থেকেই গণ্ডগোল সুরু হবে। ছোটাইকে নিয়ে আসছে।'

'মেরে ফেলেছে নাকি ?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেন গোনুদা ? আমি কিছুর মধ্যে থাকি ?'

সম্প্রতি কথাবার্তা বলাও বিপজ্জনক। চায়ের দোকানে আরও দুটি মাঝবয়সী লোক চা খেয়ে দাম দিচ্ছিল, তারা ভয়চকিতভাবে আমাদের দিকে তাকায়। আজকাল সবাই কোন না কোন পার্টির সমর্থক অথবা পুলিশের লোক। কাজেই সবাই সবাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সম্ভাবনা যেন সকলের মুখে চোখে। বন্ধুত্ব অথবা আলাপেও কোন ফয়দা নেই। আমাদের পাশের পাড়ায় এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে বাড়িতে ডেকে রাবড়ি খাইয়ে খুন করেছে। কাজেই এসব নিয়ে আলোচনা কেউ করে না। খালি বাতাসে এইসব কথা ভেসে বেড়ায়। বাতাস শুঁকে মানুষ টের পায়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বার ব্যবহার কেবল খাবার সময় অথবা বাড়ির মধ্যে কিংবা অফিসে। রাস্তায়, পাড়ায় চায়ের দোকানে, বাড়ির বাহিরে, বাজারে কেবল শব্দ স্পর্শ গন্ধ ত্বকের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ বুঝে নেয়। ছোটাইয়ের মৃত্যু নিয়ে আলোচনার কিছু নেই। মৃত্যু হলে হবে। সে পুলিশের স্পাই কিংবা স্পাই নয় এ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের সময় নেই। কারণ পুলিশ থেকে সত্যিই কিছু ছেনতাই পার্টিকে সম্প্রতি চাকরী দেওয়া হয়েছে বস্তির ভেতর থেকে রাজনৈতিক কর্মীদের গতিবিধির খবরাখবর দেবার জন্য। এবং শোনা যাচ্ছে তাতে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জিত হচ্ছে। হতে পারে বিনতার কথাই ঠিক। ছোটাই এ সবের মধ্যে ছিল না কিন্তু একেবারে নিশ্চিত করেও বলা যায় না কিছু। কাঁচের গ্লাসে মার জন্যে চা নিয়ে ফিরছিলাম। জ্বর আসছিল বুঝতে পারি নি। হাত কেঁপে গেলাস পড়ে ভেঙে গেল।

আমার অপ্রস্তুত মুখ দেখে কার্তিকের ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'চার আনার মামলা। ওর জন্যে কিছু ভাববেন না গোনুদা।' সে তখন উনুন নিভিয়ে জানলাদরজা আঁটছে।

সে সন্ধেবেলায় হিংস্রতার এক অকল্পনীয় ছবি আমাদের পাড়ায় দেখেছিলাম। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। শহরতলীর ধোঁয়ায় বাতাস ভারী। রাস্তায় আলোর বালবগুলো ভেঙে দেওয়ায় কিছুদিন থেকে পাড়ায় অন্ধকার। কিন্তু জানলার বাহিরে ম্লান চাঁদনি চোখে পড়ে। রাত আটটায় একটা বিকট একটানা আর্তনাদ কানে আসে। তারপর চুপ। আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। ধড়মড় করে উঠে বসি। মা বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস গোনু?'

আমি বললাম, 'একটু বাইরে যাচ্ছি।'

মা বললেন, 'ওদিকে যেতে দেবে না। ছোটইকে আধমরা করে ফেলে দিয়ে গেছে। জলের জন্যে চেঁচাচ্ছে। ওদিকে যাস নে।'

ভীতু লোকও হঠাৎ সাহসী হয়। আমিও সেদিন সাহসী হয়ে গিয়েছিলাম। মা-র কথা না শুনেই বেরিয়ে পড়লাম। এমন নিস্তব্ধতা আগে কখনও দেখি নি! গ্যারাজের সামনে পরিত্যক্ত একটা ঝক্কড় গাড়ির মাডগার্ড চাঁদনিতে চক্‌চক্ করে। রাস্তায় যে শুধু লোক নেই তা নয়, দরজাজানলা আঁটা বাড়িগুলো থেকে সামান্য আওয়াজও নেই। ভেতরের কোথাও আলো জ্বলছে কিনা জানি না তবে বাইরের সব ঘর অন্ধকার। বেশীদূর এগোতে হয় না। শীলেদের ভুতুড়ে প্রাসাদটার উল্টো দিক থেকে এবার স্পষ্ট মানুষের চীৎকার কানে আসে—'জল'! কথাটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। কান পেতে কিছুক্ষণ শুনলে সেই জান্তব আর্তনাদ কিসের জন্যে বোঝা যায়। কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া গেল না। দুটি তরুণ রাস্তা পাহারা দিচ্ছে, হাতে পিস্তল। 'ফিরে যান', একজন পিস্তল নাচিয়ে হুকুম দিলে, 'ফিরে যান'। আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। বোধহয় জ্বরের দরুণ কান ভোঁ ভোঁ করায় শ্রবণশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। একটি তরুণ চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনতে পাচ্ছেন না? চলে যান এখান থেকে।' আমি ফিরে এলাম।

সারারাত ছোটাইয়ের আর্তনাদ শুনেছি।

যত সময় যাচ্ছে আর্তনাদের বিরতি আরও বেড়ে যায়, ক্রমশ গলা

ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি।

অবশ্য বেশীক্ষণ ঘুমোতে পারি নি। পুলিশ আসে। আমাদের অঞ্চলের ছিয়ানব্বইজন তরুণের সঙ্গে আমিও পুলিশের সদর কার্যালয়ে হাজির হই। আমার একটা সুবিধে ছিল। প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল। তাতে চারপাশে ছেলেছোকরাদের আতঙ্ক চীৎকার বেপরোয়া মনোভাব অনাহার কোনকিছুই ঠিক পরিষ্কার মালুম হচ্ছিল না। চারপাশের প্রচণ্ড বাস্তব তখন স্বপ্নের মতো। সন্ধের পর স্ক্রিনিংয়ের আগে বিরাট লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অল্প অল্প পা টলছিল। তবে বিশেষ নির্যাতন কিছু ভোগ করতে হয় নি। ছিয়ানব্বই জনের মধ্যে আমরা ছেচল্লিশজন ছাড়া পেলাম। বাকী সবাই অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিনা বিচারে বন্দী, তাদের মধ্যে কয়েকটি বালকও ছিল।

আমার খালি একটাই ক্ষতি হয়েছিল। বাড়ি ফিরে সেটা মালুম হল। সূর্য ব্যানার্জি তার কিছু সাহিত্যের বইয়ের নামের পাতাটা ছিঁড়ে আমার কাছে জমা রেখেছিল। বইয়ের ভাঁজে ভালবাসার ওপর লেখা তার কবিতাটাও ছিল। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের যে সেপাইরা এসেছিল তারা সঙ্গীন দিয়ে কয়েকবার খোঁচা দিয়েছিল আমার বইয়ের শেলফ। তাতে ওপরের কয়েকটা বইয়ের মলাট ফুটো হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরেই আমি ছেঁড়া কবিতার পাতাটা কপি করতে বসি।

১১

তিন বছরের বোনাস জমানো টাকায় জাঁকাল বিয়ে করলাম। বোমার আওয়াজ ছাপিয়ে শানাই বাজল, চারদিকের নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে আমাদের বাড়িটা ঝলমল করল নিওন আলোয়।

আসলে গত দেড়বছর জুড়ে আমাদের অঞ্চলে যে থমথমে আবহাওয়া তার বিরুদ্ধে শানাই বাজিয়ে বিয়েটা আমার অন্তরের প্রতিবাদ। ত্বছর আগে যখন ঘটনা মোড় নিচ্ছিল, যখন ধীরে ধীরে আমাদের অঞ্চলের তরুণরা তাদের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসের নিয়ন্তা হবার জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন আমিও মনেপ্রাণে তাদের সঙ্গেই ছিলাম। কিন্তু গত কয়েকমাস ধরে এক অদ্ভুত হত্যার চংক্রমণে ইতিহাস আবদ্ধ। এখান থেকে ইতিহাসকে বার করার প্রয়োজন আছে। আমি রাজনৈতিক নেতা নই, এমন কি কর্মীও নই, আমি একজন কারখানার সুপারভাইজার যে তার প্রমোশনের জন্যে সচেষ্ট। সবই ঠিক। কিন্তু আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। আমার সাধারণ মনুষ্যত্বের মর্যাদা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আমরা ইতিহাসের নিয়ন্তা নই কিন্তু ইতিহাস আমাদের বাদ দিয়ে নয়।

তাছাড়া সূর্যের অবর্তমানে চারপাশের আন্দোলন থেকে নিজেকে বিযুক্তির প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। উপির সঙ্গে আলাপের ব্যর্থ চেষ্টায় আমি ভগ্নমনোরথ। আলাপ আর সম্ভব নয়, এখন কেবল শ্রবণ, মন্ত্র জপ। আলোচনা যুক্তি অসম্ভব। তার ফলে এ আন্দোলনের প্রথম দিকে যেমন সাধারণ মানুষের শত্রুরা কোণঠাসা হয়েছিল তেমনি তারা এখন শুধুই তাদের স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসে নি, ফিরে এসেই তাদের উপস্থিতি জানান দিয়ে দিচ্ছে। পুলিশের প্রবল পরাক্রমে বেশীর ভাগ তরুণই জেলে, কেউ মৃত। কাজেই শ্যামল গাঙ্গুলী আবার অব্যাহতভাবে তার ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছে। ছেনতাই পার্টি, ওয়াগনব্রেকার, কালীপূজোর চাঁদার মস্তান, যারা আমাদের শহরতলীর সামাজিক জীবনে

ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল এবং সূর্য ব্যানার্জির বিক্রমে সাময়িক স্তব্ধ ছিল, তারা আবার ফিরে এসেছে। আমার সবচেয়ে বিবমিষার কারণ ঘটিয়েছে দুই কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মীদের পরস্পর নিশ্চিহ্ন করার উদগ্র অভিযান এবং তাদের নেতাদের প্রবল উরু থাপড়ানো আস্ফালন। এই আস্ফালন যে মূলত পেটিবুর্জোয়া আস্ফালন তা ঘটনার প্রবল স্রোত আমাকে বুঝতে বাধ্য করে। কোনরকম মনের মাধুরী দিয়ে বা মন্ত্র জপ করে এই হত্যার অভিযানকে কৃষিবিপ্লব বা অন্য কোন বিপ্লব বলে ভাবতে পারি না। এবং যে আশঙ্কা করেছিলাম তারই বাস্তব পরিণতি আমার চোখের সামনে ঘটতে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে সূর্য ব্যানার্জি যে স্বপ্ন আমার সামনে তুলে ধরে আমার সমস্ত যৌবন রাঙিয়ে দিয়েছিল সেই স্বপ্নও ফিকে হয়ে যেতে থাকে। আমি এখনও মানি যে এই স্বপ্নের ভিত ছিল, তা আকাশকুসুম রচনা নয়। ভারতবর্ষে কৃষিবিপ্লব ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ, সূর্য ব্যানার্জির এই কথা আমাদের সমস্ত শতাব্দী জুড়ে ধ্বনিত হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন মানবতাবোধের কবিতা যা আমাদের দুঃস্থ দীন বঞ্চিত অস্তিত্বকেও সহনীয় করে তুলে আমাদের নতুন মানুষে পরিণত করতে বাঙ্ময় হয়েছিল তার প্রয়োজন শুধু ফুরোয় নি নয়, কখনও ফুরোবে না।

সূর্য বলত, অবতারের কাঁধে চেপে ইতিহাস আসে না, ইতিহাস আসে আমাদের মতো মানুষের কাজে, আচরণে। একথা কখনও মিথ্যে হবে না। আমার ক্ষোভ, এই সমস্ত বোধ রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চারিত হয় নি, সেক্ষেত্রে এক অবতারের বদলে আর এক অবতারের বন্দনা। নতুন মূল্যবোধের বদলে পুরনো মূল্যবোধকেই নতুন কায়দায় আহ্বান। এবং সেজন্যে যা ভয় করছিলাম তাই বোধহয় হতে চলেছে। সূর্য ব্যানার্জি ব্রাত্য হয়ে পড়েছে, তার নেতৃত্ব শুধু আলগা হয়ে যায় নি, এ অঞ্চলে তার প্রবেশও বোধহয় কাম্য নয়। মাসের পর মাস আমি চারপাশের দিকে চেয়ে আঁকপাঁক করেছি, এই ভ্রাতৃহত্যা, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে স্কুলকলেজ পোড়ানো আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি।

চলে আসার আগে উপমন্যুর সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়েও আলাপ করেছিলাম। এবং ইতিহাসের যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় নিস্তব্ধ হয়েই ছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, আমাদের দেশের উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণকে নিয়ে যারা প্রবল মাতামাতি করে, সভায় সভায় বক্তৃতা করে, তারা যেমন ভ্রান্ত তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণকে নস্যাৎ করাও ভ্রান্ত। এ ব্যাপারেও আমার বন্ধু, আমার সবচেয়ে প্রিয় চিন্তানায়ক সূর্য ব্যানার্জি আমাকে পথ দেখিয়েছিল। সূর্য আমাকে ভারতবর্ষের ওপর কার্ল মার্কসের চিঠি পড়িয়েছিল। বাস্তবিক ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের ফলশ্রুতি অমৃতগরলে মাখামাখি অবিভাজ্য বস্তু। তার গরলে আমরা পুড়েছি. আমাদের গ্রামজীবন তছনছ হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অমৃত বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বিতরণ করেছেন। গোলদীঘিতে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মর্মর মূর্তির মস্তকছেদের ছবি আমার কাছে বিপ্লবের এক কমিক চেহারা হাজির করেছিল। উপিকে আমি চীনের কথা বলেছিলাম। উপি বলেছিল, 'চীন থেকেও আমরা এগিয়ে যাব।' অনেক কষ্ট করে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলেছে, তাকে এগিয়ে নেবার জন্যে কোন নাটুকেপনা অবান্তর।

আমি তাই চেয়েছিলাম বোমার আওয়াজ ছাপিয়ে যাতে শানাই বাজে। এবং তাই বেজেছিল। অবশ্য অনেক খাবার নষ্ট হয় সে রাতে। কারণ বোধহয় অর্ধেকের বেশী নিমন্ত্রিত আসতে পারেন নি। সস্ত্রীক পোচখানেওয়ালা এসেছিলেন একটা চমৎকার আইসক্রিম-সেট উপহার নিয়ে। সেটটা যেমন সুন্দর তেমনি অপ্রয়োজনীয়। আর একটা কারণও ছিল। এত বেশী টিকটিকি আমার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল যে, এমন জঁাকাল বিয়েতে তারা হয়তো সাময়িকভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে এই আশা ছিল। তারা কিন্তু হয়নি। বরং তারা আরও তৎপর হয়ে উঠেছিল। হয়ত আমার বন্ধুর আবির্ভাব হতে পারে এই আশায়।

বিয়ের পর কয়েকদিন যেতে না-যেতেই আমি এক পারিবারিক

বিপ্লবের সম্মুখীন হলাম। এক চিরপরিচিত প্যাচপেচে নাটকের আমরা তিনজন নায়ক নায়িকা এবং এত ক্লান্তিকর এক আয়ুক্ষয়কারী অনুষ্ঠান যে ব্যাপারটা যত কম আলোচিত হয় ততোই ভাল। আমার খালি মনে হচ্ছিল খোলা মাঠে হাঁটছিলাম, হঠাৎ গোবরের গাড্ডায় পা ডুবে গেছে, আর উঠতে পারছি না। সবসময় যে প্রবল চীৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে তা নয়, তা হলে বরং ভাল ছিল, সব চুকেবুকে যেত, অথবা একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যেত। কিন্তু তা হবার নয়। সর্বদা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতো এই পারিবারিক নাটক আমাকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুলেছিল। অথচ আমি আমার মা এবং বিনতার কাউকেই নির্দিষ্ট করে দায়ী করতে পারতাম না। আবার আমি বলছি, একদিকে মানুষের শৌর্যের চেহারা আর একদিকে তার অপরিসীম ভঙ্গুরতা আমাকে স্তম্ভিত করেছিল। আমার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের এক আশ্চর্য চারিত্রিক পরিবর্তন আমায় মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে ভাবিত করে তুলেছিল। সত্যিই যা সুকুমার শান্ত বুদ্ধিদীপ্ত, তা কেন অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এমন আবদারে নালিশপরায়ণরূপ ধারণ করবে? রোজ শোবার আগে বিনতার মাসীমার স্বাচ্ছল্যের গল্প শুনতে শুনতে আমি পাগল হওয়ার জোগাড়। একদিন বলেই ফেললাম, 'তোমার আত্মীয়রা বড়লোক কি গরীবলোক তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না, বিশ্বাস করো।'

বিনতা সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠল, 'আর মা যে তার বাপের বাড়ির গল্প করে আমার কান পচিয়ে দিলে, সে বেলায় কিছু বলবে না?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'মা বাপের বাড়ির গল্প করেন নাকি?' কারণ, এসব গুণ তাঁর কোনকালে ছিল না।

'গল্প তো শুধু নয়, খোঁচা দেবার জন্যে গল্প।'

'কী রকম?'

'কী রকম আবার কী?' তোমাদের বাড়িতে এই ছিল? আমাদের বাড়িতে এই ছিল। আমি তো বললাম মাকে, 'আপনার ছেলে তো দেখেশুনেই আমাকে বিয়ে করেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিনতা বলে, 'আর সেই আদান প্রদানের কথা। ওঁর কোন এক বন্ধু না আত্মীয়ার বাড়িতে মেয়ের পক্ষ থেকে কী রকম তত্ত্ব করে—এমনকি টিনে করে কইমাছ আসে—এইসব। আমার কেমন মনে হচ্ছে, তুমিও আসলে এইরকম ভাবো। নিজে বলতে পারো না, তাই মাকে দিয়ে বলাচ্ছো।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্যে আমার অনুকম্পা হয়। সত্যিই একটা গোটা জাতের ভঙ্গুরতা একটা লোক কী করে বইবে? মা রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলতে পাগল। কিন্তু তাঁর একমাত্র ছেলের বিবাহে এই সুকুমার জগত হঠাৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এ ছাড়া আমাকে নালিশ শুনতে হোত। মা আমার জন্যে খুব যত্ন করে রাঁধতেন। কিন্তু মন যদি ভার হয়ে ওঠে তাহলে জিভে যে আস্বাদ পাওয়া যায় না, এই সাধারণ জ্ঞান তাঁর হারিয়ে গিয়েছিল। নালিশ শুনতে শুনতে এমন একটা তাল পাকানো প্রতিবাদ গলার কাছে উঠে আসছিল যে, চমৎকার কইমাছের ঝাল খেতে গলায় কাঁটা আটকে কেলেঙ্কারি। মা আবার প্রত্যেক অনুযোগের আগে একটা ভূমিকা রাখতেন, 'তোর আবার শুনতে খারাপ লাগবে গোনু কিন্তু···'। আমি এই ভূমিকা আরম্ভ হতে না হতেই সিঁটিয়ে যেতাম।

একদিন এরকম পারিবারিক ঝোড়ো হাওয়ায় আমার কি মতিভ্রম হোল আমাদের কারখানার রমেনকে গলগল করে একরাশ কথা বলে দিলাম। রমেন কথাবার্তায় চালাকচতুর। সাম্প্রতিক নির্বাচনে আমাদের অঞ্চলের এম-এল-এ নির্বাচিত হয়েছে। সব কথা শুনে বললে, 'আপনি আপনার টাংটা একটু টুইস্ট করে দেবেন।'

'তার মানে?'

'জিভে তো কোন হাড় নেই। মার কাছে একরকমভাবে জিভটা ঘোরাবেন, স্ত্রীর কাছে আর একভাবে। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবেন, একেবারে পীসফুল কো-এগজিসটেন্স।'

রমেনের উপদেশ অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সফল হয়নি। পারিবারিক ঝোড়ো হাওয়ায় বিপর্যস্ত হচ্ছিলাম, জিভ নানাভাবে

নানাদিকে ঘোরাচ্ছিলাম কিন্তু সেই ঘ্যানঘেনে প্যাচপেচে মনোমালিন্য চেপে বসে ছিল। ঠিক এমনি সময় এক রাতে সূর্যের উদয়।

সেদিন বোধহয় ছিল বাইশে শ্রাবণ। ভোরবেলা কারখানা যাবার মুখেও 'সমুখে শান্তি পারাবার' শুনেছিলাম রেডিওতে, দুপুরে ক্যানটিনে খেতে খেতে দ্বিতীয় দফায় বেহালায় একই গান এবং এখন রাতে আবার সেই কণ্ঠসঙ্গীত। বন্ধ করব কিনা ভাবছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ে। এই মৃদু আওয়াজ বহুদিন শুনিনি। বিনতার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলি। সূর্যকে দেখামাত্র আমি জড়িয়ে ধরলাম। এক ডুবন্ত লোকের আশ্রয়ের মতো আমার সেই জাপটে-ধরা আলিঙ্গনে সে যেন অসোয়াস্তি বোধ করে। শক্ত হাতে আমাকে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'আপনার বিয়েতে আসতে পারি নি। কিছু মনে করবেন না।'

বিনতার দিকে চেয়ে বললে, 'আপনার স্ত্রী? বাঃ বেশ! এবার ভাবছি আমিও বিয়ে করব।'

এবার আমি তার দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হই। বরাবরই সে সিরিয়াস ছেলে। যে-সব হাল্কা রসিকতা সামাজিকতার অঙ্গ, সে ধরনের সামাজিকতা থেকে সে বরাবরই মুক্ত। সে খুব রোগা হয়নি। বরং রোদে পোড়া তামাটে লাগে তার মুখ ঘাড়। কিন্তু তার মুখের চেহারা একটু পাল্টে গেছে। বড় একজোড়া চেটাল গোঁফের জন্যে নয়, একটু বেশী ম্লান নিষ্প্রভ।

'চা করব?' বিনতা বলল।

'চা? বাঃ বেশ, শুধু চা দিয়েই বিদায় করতে চান।' চেঁচিয়ে হেসে উঠল সূর্য। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, 'সামনের রোববার সকালে আসব আপনার হাতের রান্না খেতে।'

'এখন এক কাপ চা দিই?'

'আচ্ছা দিন। জলযোগ করা যাক, কী বলুন?'

বিনতা ঘর থেকে বেরোতে না-বেরোতেই বললে, 'আমার জন্যে

একটা মেয়ে দেখুন। আমি একজন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে চাই।'

'আপনাকে আমার ভীষণ নতুন লাগছে।'

'বাঃ, নতুন হব না? নতুন দিনের সূর্য উঠেছে আকাশে, দেখতে পাচ্ছেন না? আমরা জিতে গেছি। বুঝেছেন, জিতে গেছি। সত্তরের দশক সত্যিই আজ মুক্তির দশকে পরিণত।'

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী ব্যাপার। এক একবার সন্দেহ হয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্যই আমার এই বিস্ময়। কিন্তু আমাদের শহরতলী অঞ্চলে যা অবস্থা তাতে সূর্য ব্যানার্জির কথাবার্তার কোন সমর্থন খুঁজে পাই না।

এবার সে ঘরের চারদিকে তাকায়। আগে যেখানে সে বসত সেই তক্তাপোষের বদলে জোড়াখাট ও এক কোণে দুটো বেতের চেয়ারের দিকে সে বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকে।

'বসুন, বসুন,' আমি তাকে ডেকে বললাম।

এবার সামনা সামনি বসে টের পাই তার চোখ দুটো আগের চেয়েও অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। এবং একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার প্রবৃত্তি সোনার চাহনিতে। অনেকক্ষণ সে কথা বলে না। আমাদের জোড়াখাটের ছত্রির দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে।

'চুপ করে আছেন যে?'

আমার কথাগুলো সোনার কানে গেল না। সে একদৃষ্টিতে যেমন চেয়েছিল তেমনি চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো চেঁচিয়ে ওঠে, 'ভালই আছি, ভালই আছি।' আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বললে, 'বিশ্বাস হচ্ছে না, না? আমাদের জয় হয়ে গেছে, জিতে গেছি। বিশ্বাস হয় না?'

সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে অসোয়াস্তি হয়। এরকম জেরা করার মেজাজ তার আগে ছিল না।

'দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন। দুনিয়া পাল্টে যাচ্ছে। আর যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে, এটা আজকে রাশিয়া বলছে, চীন

বলছে, আমেরিকা বলছে। সমাজতন্ত্রের জয়পতাকা উড়ছে চারদিকে। আমাদের দেশ কদিন ঠেকিয়ে রাখবে ? শিগগিরই, কয়েক বছর কেন, কয়েক মাসের মধ্যে দুনিয়ার চেহারা পাল্টে যাবে। আমাদের ছেলেরা যে এত রক্ত ঢালল, তা কি কখনও বৃথা যায় ?'

আমি বোধহয় হতবুদ্ধির মতো তার দিকে চেয়েছিলাম। সোনা চা খায়। আমি গুম হয়ে বসে থাকি। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়লাম,—'আপনি কি মহাকাশের কবিতা শোনাতে এসেছেন ?'

সোনা ভুরু কুঁচকে তাকাতেই বললাম, 'মানে, আমেরিকাও মহাকাশে রকেট ছাড়ছে, রাশিয়াও ছাড়ছে। এখন সব ভাই-ভাই। দুনিয়ায় সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়বার দরকার নেই, মরবার দরকার নেই। এই কথাটা শোনার জন্যে তো এত কৃষিবিপ্লব করার দরকার ছিল না। এত জ্ঞান নেবার এত জ্ঞান দেবার দরকার ছিল না।'

সোনা টেনে টেনে হাসে। তার হাসি যেন ফুরায় না। 'বাঃ, আপনি তো মশাই ভাল বক্তৃতা করেন। আপনাকে এখন আমাদের দরকার হবে। আমাদের রিকন্সট্রাকশান পিরিঅডে, আমাদের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়।'

'আপনি কী বলছেন ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছেন না—না ? বুঝবেন, বুঝবেন। আমি একটু আগে আগে বুঝি, এই হয়েছে মুশকিল।···সামনের রোববার সকালে খাচ্ছি। আপনার স্ত্রীকে বলবেন।'

আমার অনেকগুলো প্রশ্ন মনের মধ্যে জেগে ওঠে কিন্তু বলতে পারি না। রোববার সকালে সে আসবে নেমন্তন্ন খেতে, তার মানে সে আর সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখে বিপজ্জনক ব্যক্তি নয়।

কিন্তু আমি ঠিক এই প্রশ্ন না করে অন্য প্রশ্ন করি, 'আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন ?' আমি বলতে চাইছিলাম, যদি কোন অসুবিধে না হয় তাহলে এখানেই রাত কাটান। কারণ আলাপ না করে আমি আপনাকে যতখানি বুঝতাম এখন আপনার সঙ্গে আলাপ করে দুর্বোধ্য লাগছে।

'এখন যাচ্ছি মানিক দাসের বাড়ি, কাল ভোরে যাব রমেনের কাছে।'

'রমেনের কাছে? মানে? বিস্ময়ে আমি চেঁচিয়ে উঠি। কারণ সাম্প্রতিককালে আমার সবচেয়ে বিবমিষার কারণ ঘটিয়েছে রমেন ও সোনাদের পার্টির পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করবার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এখনও সে সংগ্রাম শেষ হয়নি তা নয়, কান পাতলে এখনও সে সংগ্রামের আওয়াজ কানে আসবে।

'কেন যাব না? চীন আমেরিকা বোঝাপড়ায় আসতে পারে, আর আমি রমেন আসতে পারব না।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনি একেবারে পীর-পয়গম্বরদের মতো কথা বলছেন।'

'আমি পীরপয়গম্বরই হতে চাই।

সোনা আবার বললে, 'আসলে কী চাই জানেন? ভগবান আর আমাদের সাম্যবাদে একটা মিলন। ভাববাদ আর বস্তুবাদের একটা সমন্বয়। ভাববাদের প্রয়োজন আছে। হেগেলের প্রয়োজন আছে। হেগেল থেকে মার্কস। তার মানে হেগেলকে ছেঁটে ফেলা নয়।'

আমি বিমূঢ়ভাবে বললাম, 'আপনি যে কৃষিবিপ্লবের কথা বলতেন!'

'এর মাঝখানেই কৃষিবিপ্লব। আসলে গাঁয়ের লোকেরা ভগবানকে ভালবাসে। আমাদের মতো তারা ভাবে না। তাদেরকে আমরা শেখাব, তারা আমাদের শেখাবে। এই সমস্ত ব্যাপারটাই কৃষিবিপ্লবের অংশ।'

সত্যিকথা বলতে কি, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। কিংবা আংশিক বুঝতে পারি, সবটা পারি না। তার কথায় আগেকার কথার সঙ্গে পারম্পর্য আছে আবার কোথাও নেই, বা থাকলেও ধরতে পারি না। আমি ভগবান সম্পর্কে চিরকালই এলার্জিতে ভুগি। ওটা একটা মারাত্মক কায়দা বলে মনে হয়েছে। যখনই মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে কোন ব্যাপার ব্যাখ্যায় অসমর্থ, তখনই ধাঁ করে একটা ভগবান খাড়া করেছে। সূর্য কি তাহলে সেইরকম কোন পলাতক বৃত্তি গ্রহণ করছে শেষপর্যন্ত?

'আমরা জিতে গেছি একথাটা মানতে পারছেন না ?' সোনা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বলে।

'কি করে বলব ?'

'যখন পুলিশ মিলিটারী তছনছ করে দিচ্ছে চারদিক, যখন আমাদের কমরেডরা জেলের ভেতর গুলি খেয়ে মরছে—এই তো ? এগুলো সব ছোট ভাবে দেখা। আরও বড়ভাবে দেখতে চেষ্টা করুন।'

আমি ব্যঙ্গ করলাম, 'কীভাবে দেখব ? ভাববাদ দিয়ে ?'

সোনা স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা হারিয়ে যায় কথা বলতে বলতে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ভাববাদ দিয়ে। ভাববাদ ছাড়া আপনি আমাদের এই বিরাট আন্দোলন, যা সারা ভারতবর্ষ কাঁপিয়ে তুলেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। আমাদের ছেলেরা অকাতরে প্রাণ ঢেলে দিয়েছে। কিসের জন্যে ? মন্ত্রী হবার জন্যে তারা প্রাণ ঢালেনি। তারা সমাজতন্ত্রের জন্যে প্রাণ ঢেলেছে। আমাদের খুনে বলুক, ডাকাত বলুক, আমাদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমাদের প্রভাব সর্বত্র পড়ছে, পড়বে।'

'কিন্তু আপনারা তো ফৌত হয়ে গেলেন।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। আমাদের কর্তব্য ঠিক মতো করেছি কিনা সেইটাই আসল কথা।'

আমি আবার ধাঁধায় পড়ি। সোনা যা বলছে তা অসংলগ্ন নয়, কিন্তু এটা যেন একটা অন্য লাইনের চিন্তা।

'এই লাইনে তো আপনারা এতদিন চলেন নি ?'

'এইটাই লাইন। এই লাইনেই আমরা চলেছি, চলব। এখন দেখুন, সমস্ত পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমাদের এখন নতুন পর্ব। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে কঠিন পর্ব, রিকন্সট্রাকশান পিরিঅড। নতুন করে আবার সাংস্কৃতিক বিপ্লব আমাদের করতে হবে ভারতবর্ষে।'

'কিছু মনে করবেন না। আপনাদের ঐ সাংস্কৃতিক বিপ্লবটা একদম বুঝি না। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের গলা কেটে কোন বিপ্লব হয় না।'

সোনা রেগে বললে, 'ওরকম খবরের কাগজের সবজান্তাদের মতো কথা বলবেন না।'

আবার চুপ করে থেকে বললে, 'ঝড়বৃষ্টিতে বড় বড় গাছ উপড়ে যায়, চালা পড়ে। বন্যায় দেশ ভাসে। আবার পলিতে শস্য জন্মায়। অতিরঞ্জন হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু সব ছাপিয়ে আমরা একটা কাজ করেছি। দারিদ্র্য দূর করতে হলে অ্যাসেমব্লিতে বসে বক্তৃতাবাজি করলে চলবে না।'

আমি অভিভূতের মতো বলি, 'আমার কাছে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সামনের রাস্তা আরও অনিশ্চিত মনে হচ্ছে।'

'অনিশ্চিত তো বটেই,' সোনা চেঁচিয়ে উঠল। 'সমস্ত ব্যাপারটাই অনিশ্চিত, মানুষের অস্তিত্বই অনিশ্চিত। বিপ্লবের সামনে সর্বদাই প্রকাণ্ড অনিশ্চিতি। এটা যারা বুঝতে না চায় তারা মিটিং করে, প্রস্তাব পাশ করে কাগজে নাম ছাপিয়ে খালাস। ঝাঁপ দেওয়া মানেই অনিশ্চিত লক্ষ্যের পেছনে ছোটা।'

আমি চেঁচিয়ে উঠি, 'আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। জিতেছেন কোথায় মশাই আপনারা? মেরে তক্তা বানিয়ে দিচ্ছে আপনাদের। একটার পর একটা ঘাঁটি পুলিশ দখল করে নিচ্ছে। শয়ে শয়ে ছেলেরা জেলে যাচ্ছে। আপনি কী বলছেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আপনি বিশ্বাস করুন। আমি আপনার মতো লেখাপড়া করি নি। আপনার মতো কৃষিবিপ্লব করি না। আমি কারখানার সুপারভাইজার। আমি সারা জীবন সুপারভাইজারি করব। কিন্তু আমি তো ঘাসে মুখ দিয়ে হাঁটি না। আমাকে বুঝিয়ে দিন। কোথায় জিতলেন? কেমন করে জিতলেন?'

আমার বোধহয় গলা চড়ে গিয়েছিল। দেখি মা এসে দরজায় দাঁড়িয়েছেন। বিনতাও তার সঙ্গে। কিন্তু আমি তখন আর এক জগতে

প্রবেশ করেছিলাম। আমার সেই সৌরজগতে যেখানে মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য ব্যানার্জির বক্তব্য আমি মানি কিংবা না মানি সে যে একটানে আমাকে এই বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত জগতের ছোট্ট সুখ ছোট্ট দুঃখের চৌহদ্দী থেকে বাহিরে এনে ফেলেছে তা মর্মে মর্মে টের পাচ্ছিলাম। আমি তাই মাকে বিনতাকে দেখেও দেখি না। একবার খালি হাত তুলে ওদের ভেতরে যেতে বললাম।

সোনা যেন আমার শেষ কথাটা শুনতে পায় নি। বললে, 'সারা জীবন কারখানার সুপারভাইজারি করবেন? সে কী? সমস্ত পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে। মানুষ পাল্টে যাচ্ছে। আর আপনি সেই কুয়োর ব্যাঙের মতো পচবেন? এসব ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে গাঁয়ে চলুন। আমার একজন মাঝিই সবচেয়ে বড় বন্ধু। ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছে। অথচ এই জীবন জগত সম্পর্কে কী জ্ঞান!···আমি তো ভাবছি ওর বাড়ির পাশেই ক্ষেত করে থাকব। আপনিও আসুন।'

সোনার ডাকে একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল অথবা হয়তো আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি। এ এমন ধরনের মারাত্মক প্রেম যা নরনারীর শারীরিক আকর্ষণের চেয়েও প্রচণ্ড, যা মানুষকে তার সমস্ত প্রাচীর ভাঙতে সাহায্য করে, অনিশ্চিতির পেছনে ছোটায়।

সোনা হঠাৎ বললে, 'কিন্তু একটাই অসুবিধে। আমাকে একটা মহিলা দিন।' সোনা এমনভাবে বললে যে আমার হাসি পেয়ে যায়।

সোনা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'আমি ঠিক মানিয়ে নিতে পারব। একজন কমবয়সী মহিলা, ঠিক হাবাগোবা নয়।'

'আপনি যখন বলছেন গাঁয়ে ক্ষেত করে থাকবেন তখন···'

সোনা ম্লান হাসি হেসে বললে, 'আমি চেষ্টা করেছিলাম, জানেন। কিন্তু ঠিক সুবিধে হয় নি। আমাকে বললে কী জানেন? বললে, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

আবার আমার সব ওলোট পালোট হয়ে যায়। আমি যেন একই সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় দোল খাই আবার ঢেউয়ের ঝাপটে আছাড়

খেয়ে পড়ি। এতক্ষণ পর আমার একটা প্রশ্ন মাথা চাড়া দেয়, সত্যিই কি কোন গণ্ডগোল হয়েছে? চারপাশের প্রবল চাপেই কি সূর্য ব্যানার্জির নার্ভস-সিসটেম ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে তাই সে এক সুন্দর কিন্তু অবাস্তব জগতের দিকে হাত বাড়িয়েছে? মহিলার সান্নিধ্যের জন্যে এই আঁক-পাঁক করা কেন?

সোনা বললে, 'আমি সামনের রোববার আপনার সঙ্গে একবার কলকাতায় যাব।...ঘাবড়াবেন না, কোন বিপদে ফেলব না। আমি কয়েকজন লেখক কবিদের সঙ্গে দেখা করব।'

আমি জিজ্ঞাসা করায় সোনা তাদের নাম করল। আবার আমি বিমূঢ় বোধ করি। এঁরা নিশ্চয় শক্তিশালী লেখক এবং বাজারের লেখক নন। এঁদের কারুর কারুর লেখা সম্পর্কে শুনেছি কিন্তু আমার বন্ধুর মতো বিশেষ তলিয়ে পড়ি নি। কিন্তু এই মুহূর্তে এঁদের সঙ্গে দেখা করাব প্রয়োজনীয়তা কি এতই জরুরী! দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটা ঠিকানাও দেখালে সোনা। কিন্তু এটা কি প্রবল ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না তার পক্ষে?

সোনা বললে, 'আগেও ভেবেছি দেখা করব। কিন্তু তখন সম্ভব হয় নি। কিন্তু এই রিকন্সট্রাকশান পিরিঅডে...'

'কিছু মনে করবেন না। আপনার কথা আমার হেঁয়ালী লাগছে।'

সোনা জোর দিয়ে বললে, 'হেঁয়ালী কথা ভয় করবেন না। অনেক ভাল কথাই হেঁয়ালী কথা। আপনি একটা কাজ করুন। এই চিঠিটা গৌরীকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।...আর একটা চিঠি আপনাকে লিখে-ছিলাম বেশ কিছুদিন আগে। দেখতে পারেন।'

দুটো ভাঁজ করা চিরকুট টেবিলের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে উঠে সোনা হাত তুলে বললে, 'আমি আজ চলি। আপনার স্ত্রীকে বলবেন—রোববারের খাওয়াটা কিন্তু'...সোনা বেরিয়ে গেল।

সে রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি। সোনার অনেক কথা আমার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেগুলো আমার ঠিক অসংলগ্ন বলে মনে হয় নি

কিন্তু কিছু কিছু অন্তত অচেনা ঠেকেছিল। আমার বাড়িতে এ রাতের আবির্ভাব পুলিশের নোটিসে না আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু সামনের রোববার সে দিনের বেলায় ড্যাং-ড্যাং করতে করতে আসবে। এ অঞ্চলে এখন সর্বত্র মিলিটারী ও পুলিশ। সেক্ষেত্রে এরকম যেচে নেমন্তন্ন খাওয়ার উৎসাহ শুধু বিপজ্জনকই নয়, একেবারে অস্বাভাবিক তার ক্ষেত্রে। এরকম শরৎচন্দ্রের নায়ক হবার অভিলাষ তার কোন কালে ছিল না। তাছাড়া সে যদি আমার বাড়িতে ধরা পড়ে সেদিন তার মানে গৃহস্বামী হিসেবে আমারও হাতে হাতকড়া। আর মজা হোল, যে রাস্তায় আমি হাঁটছি না সেই রাস্তার পথিক ভেবে আমি সাজা পাব। তাছাড়া তারা জিতে গেছে এটাই বা কী রকম ব্যাপার? এরপর কি সূর্য ব্যানার্জি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারত তীর্থ' কবিতা আবৃত্তি করবে?

খুব ভোরে উঠে মুখ না ধুয়েই আমার চিঠিটা খুললাম। তখনও না এবং এখনও একবর্ণ বুঝিনি। ঠিক যেভাবে লেখা ছিল সেইভাবে আমি কপি করছি। ওপরে নীচে কারুর নাম নেই।

'রেখাগণিতে বলে দুই সমান্তরাল সরলরেখা মেলে অসীমে। গণিতে বলে শূন্য দিয়ে যে কোন সংখ্যা বিভক্ত হলে ভাগফল হয় অসীম, আর শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে হয় আন্‌ডিটার্মিণ্ড অর্থাৎ সেই প্রকাণ্ড অনিশ্চয়তা—সমগ্র মানবজাতির বাঁচার ও বিকাশের মন্ত্র। আপনার কাছে চারপাশে যা ঘটছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু অনিশ্চিত মনে হতে পারে। সত্যিই আমরা এক অনিশ্চিত বসন্তকালের পেছনে ছুটে চলেছি। এই ছুটতে ছুটতেই হয়ত আমরা শেষ হয়ে যাব। তার সম্ভাবনাই বেশী, কিন্তু আমাদের এই বসন্তকালের জন্যে প্রার্থনা, এই সত্যিকার নতুনের জন্যে সর্বস্ব পণ করে নিজেকে ঢেলে দেওয়া—এইটুকু আমরা রেখে যেতে পারব। এইটাই যথেষ্ট নয় কি? শুধু প্রয়োগবাদ দিয়ে আমাদের সাফল্য বিচার করবেন না। আমাদের জয় বুঝতে গেলে আপনাকে ভাববাদের আশ্রয় নিতেই হবে। এই অসংলগ্ন মর্মান্তিক কবিতার যে অর্থ তা কেবল নির্ধারণ করতে পারেন এই পথেই। আমরা

জয়ী, আমাদের মৃত্যুও সেই জয় ঘোষণা করে।'

দ্বিতীয় চিঠিটা খুলে ফেলি। জেলের ভেতর একজন কমরেডকে লেখা চিঠিটা পড়বার কৌতূহল দমন করতে পারি না। এ চিঠিটা আমার কাছে উল্লেখযোগ্য কারণ আমাকে লেখা চিঠিটার চেয়েও এ লেখায় তার মনের অবস্থাটা আমার কাছে পরিষ্কার। সে যে অসুস্থ এ কথাটা এই চিঠি মারফতই জানতে পারলাম। এ চিঠিটার ওপরে নীচে কারুর নাম লেখা নেই। চিঠিটা আমি তখনই কপি করে হাত মুখ ধুয়ে কারখানা দৌড়ালাম।

বিকেলে পাড়ায় ফিরে আমি অবাক। সূর্য ব্যানার্জির আবির্ভাব চারদিকে রটে গিয়েছে বললে ঠিক হয় না, সে নিজেই তো ঘোষণা করেছে। রমেনের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব করেছে, গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীদের সঙ্গে চান করেছে, সাঁতার কেটেছে, সারা দুপুর সুধীর মিস্ত্রিকে ভারতবর্ষে কৃষিবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছে। কার্তিক ক্যাবিনেই দেখলাম সান-গ্লাসপরা দুটি পরিচিত মুখ। থানায় ডাক পড়বার আগে তাদের দেখেছিলাম বাড়ির আশেপাশে ঘুরতে।

বাড়িতে ঢুকতেই বিনতা বললে, 'আমার অবস্থার কথাটা মনে আছে তোমার?

সম্প্রতি সে অন্তঃসত্ত্বা। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'অত ঘাবড়িও না। আমি তো এসবের মধ্যে নেই। কে কী করছে পুলিশ ঠিক জানে।'

'কী করে বুঝবে তুমি এর মধ্যে নেই? তোমার বন্ধু পয়লানম্বরের আসামী...'

'বিনতা!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলা বোধহয় কর্কশ হয়ে গিয়েছিল।

বিনতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ? আমি কোথায় যাব বলো এ অবস্থায়? আমি চাই না বাবার কাছে যেতে।'

বিনতার ব্যাপারটা আমি বুঝি। সে শুধু সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক হলেও কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তার ভাইয়ের নৃশংস হত্যায় সে চারপাশের জগতটাকে একেবারে বিভীষিকার মতো দেখছে। বললে,

'চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই। মধুপুরে মামাদের একটা বাড়ি আছে। একবার গিয়েওছিলাম। অফিসে ছুটি নিয়ে চলো যাই। এখানে থাকলে আমরা সবাই মরব।'

পরদিন ক্যাজুয়াল লীভ নিলাম। খুব ভোরে গৌরীর বাড়ি গিয়ে হাজির। আসবার সময় লক্ষ করলাম, সানগ্লাস পরা তরুণ দুটির তখনও আবির্ভাব হয় নি কার্তিক ক্যাবিনে।

গত কয়েক মাসের মধ্যে গৌরী সম্পর্কে আমার মনে একটা নীরব শ্রদ্ধা জেগেছিল। প্রায় বছরখানেক হোল স্বামী ফেরার। অথচ এই ঠাণ্ডা শান্ত মেয়েটি স্কুলের কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে তাদের পার্টির সাংগঠনিক কাজ করে চলেছে। কখনও অভিভূত হতে তাকে দেখি নি। এই কুচকুচে কালো লম্বা ঠাণ্ডা শান্ত মেয়েটি তার মনের মধ্যে যে আগুনের শিখা বয়ে নিয়ে চলেছে তা যেন আমার নিজের ব্যর্থতা আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত।

সেদিন ঘরে ঢুকে আমি কিন্তু গৌরীকে প্রথম অভিভূত দেখলাম। ঢুকতে না-ঢুকতেই সে প্রশ্ন করল, 'সূর্যদার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?' তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললে, 'আপনার দেখে কিছু মনে হয়েছে? মানে, অস্বাভাবিক লেগেছে?'

আমি তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাই। সে নিজেই বলে, 'আমার কিন্তু হয়েছে, জানেন। অনেকদিন পর, কালকে হঠাৎ হাজির। আর কী বললেন আপনি ভাবতে পারবেন না।'

এবার আমি সত্যিই উদ্বিগ্নবোধ করি। তার কথাবার্তা সেদিন ঠিক অসংলগ্ন লাগে নি অচেনা লাগলেও। আর চিঠিতে সে নিজের অসুস্থতার কথা বলেছে। কিন্তু অসুস্থতা বহুদিন শরীরের ওপর অত্যাচারের ফল। রোগা হয়েছে, মুখ ম্লান দেখাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, কিছুদিন যদি বিশ্রাম নেয়, স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া করে তাহলে সেরে উঠবে।

'আমাকে বললেন, আমাকে বিয়ে করতে চান।'

আমি গৌরীর কথাটা ধরতে পারি নি। চেঁচিয়ে উঠলাম, অসম্ভব!'

গৌরী বললে, 'এখনি ওকে ডাক্তার দেখাতে হবে। যত দিন যাবে, ততো এ অসুখ বেড়ে যায় বলে শুনেছি।...আপনাকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।'

'আমাকে ?' আমি যেন সত্যিই আমার ভয়ঙ্কর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি বলে মনে হয়।

'তাছাড়া কে করবে, বলুন। আমরা সবাই সাহায্য করব। কিন্তু কাজটা আপনাকে করতে হবে।'

গৌরীর কথায় আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। আমার যৌবনের স্বপ্ন, মানুষ ও জগৎ সম্পর্কে আশা ভরসা এই শান্ত কালো মেয়েটি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল। হঠাৎ আমি মনে মনে মেয়েটার ওপর রেগে যাই। কোন একটা দুর্বল মুহূর্তে একজন কী বলেছে সেটুকু সহ্য করার ক্ষমতা হোল না ? তুমি তাকে অমনি উন্মাদ ভেবে বসে থাকলে ? এই ধরনের কতগুলো চিন্তা আমার মনের মধ্যে চাপ বাঁধতে থাকে।

'আমি বুঝতে পারছি, আপনি মেনে নিতে পারছেন না,' গৌরী বললে।

'মানুষ তার দুর্বল মুহূর্তে...।'

'আপনি একেবারে ভুল করছেন। সূর্য ব্যানার্জিকে আমরা সবাই জানি। আপনি তাঁকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। আমিও তাঁকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। আপনি তাঁকে বাঁচাতে চান কি না ? বিশ্বাস করুন, আমি তার কথায় কিচ্ছু মনে করি নি। আমি খালি তার সম্পর্কে ভাবছি। আমাদের এখন ভীষণ দুঃসময়। তার মতো লোকের দরকার আছে।'

গৌরীর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার বন্ধুর একটি কথা মনে আসছিল, 'আপনি ভাববেন না, নতুন মানুষ আকাশ থেকে পড়বে, নতুন মানুষ মানে আমরাই, আমাদের মতই খুব সাধারণ মানুষ। আমরা আমাদের নিজেদের কতখানি জাগাতে পারছি তাই আমাদের পরীক্ষা।'

সূর্য সম্পর্কে গৌরীর ব্যাকুলতা আমাকে স্পর্শ করে। কিন্তু আমি কিছুতেই মানতে পারি না তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বলতে কি, এ চিন্তা তার মৃত্যুর চেয়েও আমার কাছে ভয়ানক। কারণ মৃত্যু মানে এক অর্থে যেমন চুকেবুকে যাওয়া, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধুবান্ধবের কাছে স্মৃতির ঐশ্বর্য তা সে যেরকম স্মৃতিই হোক। কিন্তু উন্মাদ মানেই জীবন্মৃত্যুর অবস্থা, একই সঙ্গে এরকম বেঁচে মরে থাকার ভয়ঙ্কর ভবিতব্য আমার বন্ধুর ক্ষেত্রে কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

'আমাদের চেনাশোনা এক ভদ্রলোকেরও এরকম হয়েছিল। কলকাতার এক ক্লিনিকে তাকে ভর্তি করা হয়েছে, কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বললে, তার উন্মাদ অবস্থাটা সেট্‌ল্‌ করে গেছে।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আপনারা যা ভাবছেন তা একেবারে ভুল। সোনা পাগল হয়ে যায় নি। আমি বলছি, সে ঠিক আছে। সামান্য অসংলগ্ন লাগতে পারে তার কথাবার্তা আপনাদের কাছে, কিন্তু তার মানে এ নয় তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার মানে, তার চিন্তার মোড় ফিরছে, সে নতুনভাবে সবকিছু ভাবছে।'

গৌরী আমার দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

'আমি ঠিকই বলছি। তখন আমি বুঝতে পারি নি, এখন খানিকটা বুঝছি। হয়ত ও মনে করছে, শ্রেণীসংগ্রামের যে ভীষণ পর্ব এতদিন চলছিল তার অবসান হয়েছে, এখন নতুন করে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সময়।'

'আপনি বিশ্বাস করেন, এগুলো ওঁর মনের কথা?'

মেয়েটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার চিন্তা গুলিয়ে দেয়। আমি বললাম, 'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। কিন্তু আপনাকে আমি এদিকটা ভেবে দেখতে বলছি। হয়ত ও যা বলছে ও সত্যিই তা বিশ্বাস করে।'

'সূর্য ব্যানার্জি সুস্থ মস্তিষ্কে বিশ্বাস করে সারা দুপুর সুধীর মিস্ত্রিকে কৃষিবিপ্লব বোঝানো দরকার? গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীদের সঙ্গে চান করার এই সময়। আমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছে সে কথা বাদই দিচ্ছি।

ও তো কালই ধরা পড়বে, আর পুলিশের লক-আপে মারা যাবে। সেদিকটাও তো আপনি ভাববেন বন্ধু হিসেবে। ও যদি এমনভাবে ঘুরে বেড়ায় তো আপনিও বিপদে পড়ে যাবেন।'

সংলগ্ন এবং অসংলগ্নের মধ্যে একটা খুব সূক্ষ্ম লাইন আছে যার ওপর দিয়ে আমরা হাঁটি। সোনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে খালি এই কথাটাই মনের মধ্যে ঘুরছে। আমাদের নিজেদের আচরণও অনেক ক্ষেত্রে কি অসংলগ্ন নয়? একেবারে অভ্রান্ত নিশ্চিত রাস্তা দিয়ে কি আমরা বরাবর হেঁটে যেতে পারি? কিন্তু গৌরী যা বলছে তাতে তো একটা কিছু করা দরকার। অন্তত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে চেয়ে।

'আমাকে কী করতে হবে বলুন?' আমি ধীরে ধীরে বলি।

'আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলেছে?'

'সামনের রোববার সকালে ও নিজেই আমার স্ত্রীর কাছে নেমন্তন্ন বাগিয়েছে।'

গৌরী বললে, 'তাহলেই বুঝুন। এরকম ব্যবহার সে আগে কখনও করেছে?'

'তা হয়ত করে নি। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তার মাথা খারাপ হয়েছে ভাবতে পারছি না।'

এবার একটু বিরক্ত হল গৌরী। তার কণ্ঠস্বর এই প্রথম চড়তে শুনলাম, 'আপনাকে ওসব কিছু ভাবতে হবে না। আপনার বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে উনি ধরা পড়বেন। আপনিও বাদ যাবেন না।'

এতক্ষণে আমি অবস্থার গুরুত্বটা পরিষ্কার বুঝতে পারি।

'রোববার ভোরে উনি আমার কাছে আসবেন একটা চিঠি দিতে। আপনিও আসুন।'

আমার এতক্ষণে মনে পড়ল চিঠির কথাটা। বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বার করতে করতে বললাম, 'আমি ভুলেই গেছি, এ চিঠিটা আপনাকে পৌঁছে দিতে বলেছে।'

চিঠিটা আমার কাছ থেকে নিয়ে সে তার ব্যাগে পুরে ফেলল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আপনি ভোরে এসে ওঁকে কলকাতা নিয়ে যান।' আবার তার ব্যাগ খুলে একটা চিরকুট বার করে আমার হাতে দিয়ে বললে, 'ডক্টর গাঙ্গুলী,—রাজা বসন্ত রায় রোড। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। ওঁর ক্লিনিকে ইমিডিয়েটলি ভর্তি করার ব্যবস্থা করবেন।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে থাকে গৌরী। তার এই শান্ত কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ না হয়ে আমি পারি না। আবার তার ব্যাগ খুলল গৌরী। ভাঁজ করা একটা একশো টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বললে, 'এটা নিন, বাকি টাকাটা আপনি দেবেন।'

আমি মনে মনে গৌরীকে নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম। রবিবার আসা পর্যন্ত আমি এক তীব্র অপেক্ষার ঢেউয়ে ধাক্কা খাচ্ছিলাম। সূর্যকে নিয়ে পুরীর সমুদ্রের ধারে বসে আছি, বিনতা দু'হাতে দুটো প্লেটে মাংসের ঝোল আনছে বীচে এই রকম স্বপ্ন দেখলাম। হাজতে পুলিশের মারের স্বপ্নও দেখলাম।

খুব ভোরে উঠেছি। দুদিন ছুটিও নিয়েছি অফিস থেকে। এ ক'দিন এমন একটা চাপা উৎসাহে আছি যে বিনতার নজর এড়ায়নি। বিনতা আমাকে রোজই জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কী হয়েছে বল তো? প্রেমে পড়োনি তো? একেবারে ঝকমক করছে তোমার মুখ!'

সত্যিই সূর্যের আবির্ভাবে আমার অস্তিত্বের কুয়াশার ওপর এক ঝলক রোদ্দুর এসে পড়েছিল। আমারও যে প্রয়োজনীয়তা আছে বাজার অফিস ছাড়াও কিংবা সন্তান ও স্বামীর কর্তব্য ছাড়াও, এই বোধ আমাকে অনেকদিন পর আবার যেন আমার হৃত যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম, শারীরিক মানসিক সবকিছু ঝকঝকে লাগছিল আমার কাছে। পারিবারিক কোন সমস্যার কোন কথাই আমার কানে পৌঁছচ্ছিল না। আবার এই ধোঁয়াধুলো ভর্তি শহরতলীতেই আমি যেন এক নতুন সৌরজগতে প্রবেশ করেছি। আমি এখানকার এক বিযুক্ত বিপর্যস্ত বাসিন্দে নয়। আমি মানুষের

ভূতভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি।

ভোরে উঠেই আমি ঠক্ করে দরজায় কাগজ পড়ার আওয়াজ পেলাম। এবং কাগজ খুলে আমি হতবাক। জেলে গুলি চলেছে এবং সূর্য ব্যানার্জি যাকে উদ্দেশ্য করে চিঠিটা লিখেছে মৃতের তালিকায় তার নাম সর্বপ্রথম। আমি আর কাগজটা পড়তে পারি না। কাগজটা বন্ধ করে আমি খাতার ভেতর থেকে সূর্যের চিঠিটা বার করে পড়ি ঃ

'কমরেড—'

হয়তো ইতিমধ্যেই আমার সম্পর্কে এমন কিছু তোমার কানে এসেছে যা তোমার খারাপ লেগেছে। কিন্তু বিশ্বাস করো, রোগটা আমার মনে নয়, শরীরে। ঘুমটা খালি কমে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, গত ছ' মাস ঘুমাই নি। তাই থেকে হয়তো আমার কিছু অ্যাবনর্মাল ব্যবহার বন্ধুদের মনে ভুল বোঝার কারণ ঘটিয়েছে।

আমার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, আমার ব্রেন ঠিকমতো ওয়ার্ক করছে। বোধহয় কিছু অ্যাবনর্ম্যালিটি গ্রো করেছে। সেইটাই আমার অপরাধ ও দুর্ভাগ্য। আমার আশেপাশের কোন কমরেডদের সঙ্গেই কমিউনিকেট করতে পারছি না, সোজাসুজি এগোতে গিয়ে দেখি, মাঝখানে পাঁচিল। মাঝে মাঝে ভাবছি, এ পাঁচিলগুলো কি আমিই তৈরী করেছি? কিন্তু তা বোধহয় ঠিক নয়। আসলে আমিই বোধহয় একটু ছটকে এগিয়ে গিয়েছি। আমি গত কয়েকমাস যে গ্রামাঞ্চলে থাকছি, যাদের মধ্যে থাকছি, তাদের সঙ্গ আমাকে এই এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমরা পেটিবুর্জোয়া-বিরোধী হয়েও কী প্রবলভাবে পেটিবুর্জোয়া তা আমার গ্রামের বাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, তুমিই প্রথম আমাকে রাজনীতিতে টেনে এনেছিলে। আমার দেখা কমিউনিস্টদের মধ্যে তোমাকে সবচেয়ে সিন্‌সিয়ার মনে হয়েছিল। আমার পাশে যদি তুমি থাকতে তাহলে আমি আরও বেশী মনের জোর পেতাম এবং দুজনে মিলে অনেক কিছু করতে পারতাম ভারতীয় বিপ্লব ও বিশ্ববিপ্লবের জন্যে।

তুমি যদি রোজ কাগজ পড়ো তবে নিশ্চয় লক্ষ করেছো বিশ্ব রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছে। যেমন, জার্মানীকে নিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্র দেশগুলির মধ্যে নতুন চুক্তি সাধিত হয়েছে, চীনের সঙ্গে আমেরিকার দ্বন্দ্বের এক নতুন সুরাহার পথ খোঁজার চেষ্টা চলেছে ; ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়া নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে ; ভারত-চীন বিরোধের বরফ গলতে সুরু করেছে।

আরও অনেক ঘটনা ঘটছে, যা থেকে এ ধারণা মোটেই অবাস্তব হবে না যে, পৃথিবীর প্রধান দ্বন্দ্বগুলির শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হবে। আর ঐ প্রধান দ্বন্দ্বগুলির অবসান বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান সোপান। ভারতীয় বিপ্লবের জন্যে তখন আর আমাদের তরুণদের এত রক্ত ঢালবার প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু বিপ্লবোত্তর দুনিয়ার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরাট দায়িত্ব আমাদের কাঁধে এসে পড়বে। সুতরাং তোমাকে আবার বলছি নিজেকে ও কমরেডদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাও, আত্মহত্যামূলক কোন ঝুঁকির মধ্যে আমাদের কমরেডরা যেন জড়িয়ে না পড়ে। জেলের ওয়ার্ডার ও সাধারণ সিপাইদের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক গড়ে তোল। কমিউনিস্টরা সব সময় বিপ্লবের স্বার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকবে কিন্তু তাড়াহুড়োবাদের ব্যাধিতে ভুগে যেন সন্ত্রাসবাদের গাড্ডায় গিয়ে না পড়ে।

আমার শরীরটা একদম ভেঙে গিয়েছে। চেষ্টা করছি দাঁড়াতে।'

চিঠিটার নীচে মাসখানেক আগেকার তারিখ।

আমি চা না খেয়েই দৌড়লাম গৌরীর বাড়ি। কার্তিক ক্যাবিনের বন্ধ দরজার সামনে একটা বাদামি নেড়ী অকাতরে ঘুমোচ্ছে। গৌরী দরজা খুলতেই দেখলাম, সোনা বসে আছে। ভোরের আলোয় সেই নিষ্প্রভ চেহারা দেখে চমকে উঠলাম।

১২

সেদিনের মতো ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা আমার খুব কম হয়েছে। যার সান্নিধ্যের জন্যে আমি বছরের পর বছর উন্মুখ হয়ে থেকেছি, যে সত্যিই আমার বাঁচার গোড়ায় জল দিয়ে এসেছে, আমার পলিথিন কারখানার সুপারভাইজারিত্ব ছাড়াও আমার যে একটা অস্তিত্ব আছে, যার সঙ্গে মানুষের ভূতভবিষ্যৎ যুক্ত, সেই অসাধারণ মানুষটি আমার পাশে থেকেও নেই। সেদিন রাতে যতখানি সান্নিধ্য বোধ করেছিলাম দিনের বেলায় তা হারিয়ে গেল। আমি আমাদের অতীতের কথা, বর্তমান রাজনৈতিক প্রোগ্রামের কথা, এমনকি তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা, অর্থাৎ একেবারে আত্মকেন্দ্রিক ও একেবারে নৈর্ব্যক্তিক এই দুই জগতই তার কাছে তুলে ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। আমার একটা গোঁ চেপে গিয়েছিল। বোধহয় অহমিকাও এর কারণ। আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল সূর্য ব্যানার্জির অসুস্থতা সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনের মাঝখান দিয়েই সারবে। এবং আমি যদি তার কাছে থাকি, তার বেঁচে থাকবার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিতে দিই, সে যেসব কথা বলেছে সেগুলো পুনরাবৃত্তি করি, তাহলে তার অনুরণনে তার মস্তিষ্কের নার্ভগুলো আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।. অর্থাৎ মানসিক চিকিৎসার যেসব পদ্ধতি আছে সেগুলো আমি না জানলেও, আমার এতদিনের সখ্যে আমি তাকে সুস্থতার পথে আবার টেনে আনব।

সেদিন আকাশটা কালো হয়ে এসেছিল। বাস এসপ্ল্যানেডে আসতে না-আসতেই হুড়মুড় করে জল নামল। আর সঙ্গে সঙ্গে সোনা তড়াক করে বাসের সীট থেকে উঠে পড়ল। গৌরী আর এক ছোকরাকে আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। আমি তাকে আগে কখনও দেখিনি। প্রথমে তার চেহারাটা আমার পছন্দ হয়নি। অত্যন্ত পরিপাটি বেশভূষায় একটু ফোতো কাপ্তেনের মতো লাগছিল। সঙ্গীটি সঙ্গে সঙ্গে সোনার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয়। কিন্তু মিউজিয়ামের কাছাকাছি

বাস থামতেই সোনা চেঁচিয়ে উঠল, 'কদ্দিন ম্যমিটা দেখিনি।' এবং বলতে না-বলতেই সে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। আমরাও হুড়মুড় করে নামলাম। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা একেবারে ভিজে কাক।

মিউজিয়ামে ঢুকে কিন্তু মিশরীয় ম্যমির প্রতি তার ঔৎসুক্য নিভে গেল। ভারহুতের প্যানেলের সামনে সে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকল। বুদ্ধজাতকের কাহিনী অন্য সময় কি রকম লাগত জানি না কিন্তু এখন অসহ্য বোরিং লাগছিল। ভেজা শার্ট পিঠের সঙ্গে লেপ্টে থাকায় ঠাণ্ডা লাগছিল। ঘনঘন হাঁচতে শুরু করলাম। 'সূর্যদা, ম্যমিটা দেখবেন না?' ছোকরাটির প্রশ্ন কানে না নিয়ে সোনা হাতী-হাস-দ্বারীর প্যানেলে স্থির দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকল। আমার সন্দেহ হতে লাগল সে দেখছেও না ভাবছেও না, সে কিছুই করছে না। যে মহাশূন্যটা আবিষ্কারের জন্যে এত কোটি কোটি টাকা খরচা করে মানুষ রকেট পাঠাচ্ছে সেই মহাশূন্য আমাদের মনের মধ্যেই। সূর্য ব্যানার্জির রকেটটা সেখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা ধরে যায়। আমি তাকে ফেরাবার চেষ্টা করি, 'আমাদের এক অধ্যাপক একবার হনলুলুতে গিয়ে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ এক মহান দেশ। আপনি নিশ্চয় সেরকম কিছু বলছেন না।'

সোনা আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। আমার কথার সামান্য প্রতিধ্বনি তার মুখে চোখে নেই। সঙ্গী ছোকরাটি বললে, 'চলুন সূর্যদা, ভূতত্ত্ব বিভাগটা ঘুরে আসি।'

'নাঃ, চল, বাইরে যাই।'

বাইরে গিয়ে বাস কিংবা ট্রাম ধরার বদলে সে গড়ের মাঠের দিকে এগোতে লাগল। তখনও ঝিপঝিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ছোকরা সঙ্গীটি বললে, 'কোথায় চলেছেন সূর্যদা? ট্রামে উঠুন।' সোনা তার কথা না শুনে এগিয়ে যেতেই ছোকরাটি তার হাত ধরল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সোনা। চীৎকার করে উঠল, 'আপনারা কী ভেবেছেন, আমি

পাগল হয়ে গেছি? আমাকে পাগলা গারদে নিয়ে যাবেন?'

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'একদম ভুল বুঝছেন আমাদের। আপনার শরীর খারাপ, একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমি আপনাকে বলছি, আমার মাথা খারাপ হয়নি। আমাকে ছেড়ে দিন। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন'। সূর্য ব্যানার্জি হাত জোড় করে দাঁড়াল।

'আচ্ছা, আমরাও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

'কেন? ভাবছেন আমি থানায় যাব সারেণ্ডার করতে? আমি সে বান্দা নই।'

'আমাকে আপনার বন্ধু বলে এখনও ভাবেন, না ভাবেন না?' আমি মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করি।

সোনা এবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বললে, 'আচ্ছা চলুন, অনেকদিন জাহাজগুলো দেখিনি।'

সেই ঝিপঝিপে বৃষ্টিতে গোটা ময়দান ভেঙে আমরা যখন গঙ্গার ধারে এলাম তখন নদীর বুকে ত্রিপল ঢাকা ফ্লাটগুলো, বৃষ্টিতে ভেজা নৌকো, জাহাজের সারি মোটেই চিত্তাকর্ষক লাগে না। ঘোলা জলের ধারে দাঁড়িয়ে সোনা কাদার ডেলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় নদীতে। নদীর ধারে নৌকোয় বোধহয় রান্না চেপেছে। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে যায়। বটগাছের নীচের চালায় বেঞ্চিতে বসে মাল্লাদের সঙ্গে পাঁউরুটি আর আলুর দম খাই। সোনা আপত্তি করে না। বোধহয় তারও খুব খিদে লেগেছিল। দ্বিতীয়বার আলুর দম চায়। এতক্ষণে খিদে সামলে যেন ধড়ে প্রাণ আসে। সোনা আবার হাঁটতে শুরু করে দিল খিদিরপুরের দিকে। আমরা তাকে প্রায় ঠেলে ঠুলেই একট চলন্ত বাসে তুলি।

ডাক্তার গাঙ্গুলী চেম্বার বন্ধ করছিলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'এত দেরী কেন?' তারপর আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই সোনার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার শরীরটা দেখছি খারাপ করেছেন, ভেতরে আসুন।' আমরা দুজনে বাইরে অপেক্ষা করি।

আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ক্লান্তিতে চোখের পাতা জুড়ে এসেছিল। আর অনেকক্ষণ খিদে চেপেও বোধহয় শরীরটা খারাপ লাগছিল। ছোকরা সঙ্গীটির কিন্তু মুখের ভাব অপরিবর্তিত। টেবিলে সাজানো আমেরিকান ম্যাগাজিনের পাতা উল্টায়।

পায়ের শব্দে চোখ মেলি। মধ্যবয়সী ডাক্তারটির বেশ ঠাণ্ডা চেহারা। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ, বয়সের তুলনায় চুল অনেক বেশী সাদা। আমার সামনে বসে একটা সাদা কাগজে কতগুলো ওষুধের নাম লেখেন। আর একটা ছোট চিঠিও লেখেন। চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'ইমিডিয়েটলি লুম্বিনী হসপিটালে ভর্তি করান। এ চিঠিটা দেখালেই ভর্তি করে নেবে। আমি একটা ইঞ্জেকশান দিয়েছি। ওটার এফেক্ট দুতিন ঘণ্টা থাকবে। এখনই নিয়ে যান।'

আমি বললাম, 'কী হয়েছে? সত্যিই কি খুব সীরিয়াস্ ব্যাপার?'

ডাক্তার গাঙ্গুলী হাই তুললেন। চশমাটা ভাল করে মুছলেন। নিরাসক্ত ভাবে বললেন, 'একটু সীরিয়াসই বটে।'

ওঁর উত্তরে আমার কৌতূহল বাড়ে। বলি, 'বাড়িতে রেখে চিকিৎসা হয় না? হাসপাতাল মানে তো পাগলাগারদ।'

'বাড়িতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবেন? তাহলে হাস-পাতালে ভর্তি করাবেন না। তাছাড়া হাসপাতাল পাগলাগারদ এসব কথা বলবেন না। আমরা কী করব? সুস্থ মানুষকে পাগলা করে দেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। আর পাগল হয়ে গেলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। আপনি ঠিকই বলেছেন, গারদে রাখা ছাড়া আমাদের কোন রাস্তা নেই। এই নিয়ে আমার নটা কেস হোল। প্রায় একরকম সিমটম।' ভদ্রলোক সোফায় হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরান।

'সারবার চান্স কিরকম?'

'ছমাস, একবছর, দুবছর, দশবছর।' ভদ্রলোক এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখন আমার সময় নেই, আপনি অন্য সময় আসবেন। ইমিডিয়েটলি আপনার বন্ধুকে

·হাসপাতালে ভর্তি করান। আর ঐ ওষুধগুলো কিনে দেবেন।'

আমরা বেরিয়ে এলাম। আকাশ ঝলমল করছে রোদে। ডাক্তারের চেম্বারের সামনেই একটি দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের দোকান। দোকানের সামনে কালো বোর্ডের ওপর খড়িতে লেখা মেনু। সেদিকে চোখ পড়ামাত্র ক্ষিদেটা যেন চন্‌চন্‌ করে উঠল। সোনাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে উৎসাহে মাথা নাড়াল। মশলা দোসা, সম্বর খেয়ে কফিতে চুমুক দিতেই আরামে গা জুড়িয়ে এল।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় সোনা চেঁচিয়ে উঠল, 'সাইকিয়্যাট্রিস্ট! মনোবিকলন! ওসব বুজরুকি অনেক দেখা আছে!' তারপর আমার দিকে উদভ্রান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, 'আপনারা কী পেয়েছেন, বলুন তো? আমাকে জোর করে পাগল বানাবেন। আমি ভাল আছি, ভাল আছি, ভাল আছি!'

নীচু গলায় আমার তরুণ সঙ্গীটি বললে, 'এসব খাওয়ার ঝামেলা না করলেই পারতেন।'

আমি ভীষণ লজ্জা পাই। নিজের মধ্যে সাধারণ কর্তব্যবোধের অভাবে পীড়াবোধ করি। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির দিকে চেয়ে নিজেকে এই বলে সাফাই দিই যে, মাত্র দশবারো মিনিট অতিবাহিত। আমার সঙ্গীটি সোনার সঙ্গে বাহিরে এগোয়। আমি কাউণ্টারে খুচরো নেবার জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময় সঙ্গীটি হাত নাড়িয়ে ডাকতে থাকে, 'চলে আসুন, চলে আসুন।'

বাকী পয়সা না নিয়ে একছুটে বেরিয়ে আসি। সোনা হনহন করে এগিয়ে চলেছে। আমরা তার পিছু নিই। আমরা দৌড়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ঠিক এমনি সময় পুলিশের একটা ওয়্যারলেস ভ্যান রাস্তায় এসে পড়ে। তাকে এখন ধরতে গেলেই ধস্তাধস্তি হবে এবং পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, এই ভেবে আমরা তার পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে এসে জনাকীর্ণ কালীঘাট রোডে পড়ি। সামনে ইঁটের লরী, রিক্সা, দোকানের ভিড়, মুটের মাথায় বাঁশ—

সোনার গতি মন্থর হয়ে পড়ে। আমি তার হাত ধরি। সোনা আপত্তি করে না।

ব্রীজের কাছে আসতে না-আসতেই বললে, 'চলুন, ট্রামটাতে উঠি।' বলবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ানো ট্রামে উঠে বসে। আমরাও উঠি। 'আপনি সাদা বাঘ দেখেছেন? চলুন সাদা বাঘ দেখে আসি।'

তরুণ সঙ্গীটি বললে, 'কাল সাদা বাঘ দেখবেন সূর্যদা।'

সূর্য শুনল না।

কলকাতার যে-কটা একঘেয়ে জায়গায় লোকজন মরিয়ার মতো আছড়ে পড়ে সেগুলো বরাবর আমার চোখের বিষ। চিড়িয়াখানাও এরকম একটা জায়গা। চারদিকে যতো বোমা পড়ছে সিনেমায় চিড়িয়াখানায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ততো ভিড় বাড়ছে। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা সমান্তরাল ভাবে দৌড়চ্ছে, শেষে স্বাভাবিকও অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া বৃষ্টিতে ভিজে পরিশ্রান্ত অবস্থায় হঠাৎ চিড়িয়াখানার প্রবেশ পথের কিউতে দাঁড়ানো এক বিকট প্রহসনের মতো, যে-প্রহসন আমাদের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। ভূতে-ভর-করা মানুষের মতো সূর্য ব্যানার্জি বাঁদরের লাফ দেখে, কুমীরের পিঠের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে, সাপ যেন জীবনে প্রথম দেখছে এই রকম বিস্ময় তার চোখে, আর বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে, 'একেবারে ভেলভেট, হলুদ ভেলভেট'। সে দেখছে কি দেখছে না, শুনছে কি শুনছে না বুঝতে পারি না। বাঘ ভালুক ও অন্যান্য পশুপাখীর নামের সঙ্গে সে একনাগাড়ে রাজনৈতিক জগতের লোকজনদের নাম করতে থাকে। যখন সে বসে-থাকা উটের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে, 'দেখেছেন কী আশ্চর্য সুন্দর, ঠিক লেনিনের মতো,' তখন আমি হঠাৎ কেঁদে ফেলি। যে সূর্য আমাকে মানবজীবনে স্বর্গরাজ্যের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছিল, সে যে এরকম নরকদর্শনে আমাকে নিয়ে আসবে আমার হাত ধরে ভাবিনি। বোধহয় শ্রান্তিতে সূর্য হঠাৎ বললে, 'চলুন জলটার ধারে বসি।'

জমির ঢালে আমরা বসি। আমার সঙ্গীটিকে আমি চোখ টিপে

ইশারা করি। জলে ঝাঁপ দেবার প্রবণতা সম্পর্কে আমি আগে পড়েছি। সঙ্গীটি এগিয়ে বসে। অদূরে গোল হয়ে বসে একটি উত্তরভারতীয় পরিবার পিকনিক করছে। গ্রামোফোনে ফিল্মের গান বাজে, টিফিন ক্যারিয়ার থেকে কেউ কেউ খাবার খায়, দুটি সুদর্শন বালক রেস দিতে দিতে একেবারে জল পর্যন্ত পৌঁছে চীৎকার করে হেসে ওঠে। আকাশ ভর্তি পাখি।

একটা কালো রাজহাঁস আমাদের পায়ের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। সেই খয়েরী বঙ্কিম পেলবতার মাথায় টকটকে লাল সূর্যের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিনেবাদামের ঠোঙা থেকে বাদাম ছুঁড়ে ছুঁড়ে পাখিটাকে খাওয়ায়। দুটো তিনটে বাদাম মাত্র অবশিষ্ট ছিল। 'আর নেই, ছ্যাখ' বলে সূর্য ঠোঙাটা ছিঁড়ে ফেলে। বাংলা খবরের কাগজের একটা রিপোর্ট 'পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনটি তরুণের মৃত্যু।' সূর্য একমনে রিপোর্টটা পড়তে থাকে। আর রাজহাঁসটা থমকে দাঁড়িয়ে থাকে তার পায়ের কাছে। 'কিচ্ছু থাকবে না, এসব আর কিচ্ছু থাকবে না, দেখবেন, সমস্ত দুনিয়ার চেহারাটা পাল্টে যাচ্ছে।' বলে সে কাগজটা তাল করে ছুঁড়ে দেয় জলে। রাজহাঁসটা ঠোঁট ডুবিয়ে ধরে ফেলে। তারপর ফেলে দিয়ে জল কাটতে কাটতে এগোয়।

'এসব কিছু থাকবে না, কী থাকবে জানেন?' আমার দিকে তাকায় সূর্য। সেই আগের মতো দৃষ্টি তার চোখে।

'কী থাকবে?'

'ঐ যে, ওরা আর আমরা।' সূর্য আঙ্গুল দিয়ে দেখায় অপসৃয়মান কালো রাজহাঁসটির দিকে। সে তখন জুটি বেঁধেছে জলের মাঝখানে।

আমি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি। বিকেল পড়ে আসছে। আকাশ ভর্তি হাঁস বক পানকৌড়ী। জেলের কমরেডকে লেখা সূর্যের চিঠিটার লাইনগুলো মনে পড়েঃ 'আরও অনেক ঘটনা ঘটছে যা থেকে এ ধারণা মোটেই অবাস্তব হবে না যে পৃথিবীর প্রধান দ্বন্দ্বগুলির শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হবে।...ভারতীয় বিপ্লবের জন্যে তখন আর আমাদের তরুণদের

এত রক্ত ঢালবার প্রয়োজন থাকবে না।'

সেই আকাশভর্তি পাখির দিকে চেয়ে চেয়ে আমি ভাবতে থাকি, সূর্যের মানসিক ব্যাধির কারণ কি এই আশাবাদ, যে আশাবাদ সচরাচর রাজনৈতিক জগতে একটা বাত-কি-বাত মাত্র! সূর্য ব্যানার্জি সেই জীবন্ত আশাবাদের জ্বলন্ত অঙ্গার তার বুকে ধারণ করে তার বুক পুড়িয়ে খাক করেছে। আমার কেবল ভয় হতে থাকে সেই দ্বন্দ্ব-পার-হওয়া স্বর্গরাজ্যে, যেখানে সে আর কালো রাজহাঁস অধিবাসী সেখান থেকে সে ফিরবে না। চারপাশে দ্বন্দ্ব বাড়বে, রক্তক্ষয় চরমে উঠবে, আদর্শের জন্যে সংগ্রামের নামে বারে বারে ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি বসাবে, তরুণের রক্তে ড্রেন ভরে উঠবে। আর এই পাখিতে ঢাকা আকাশ, এই দ্বন্দ্ব-অতিক্রান্ত সমন্বয়ের নীলিমা ঢেকে রাখবে সূর্য ব্যানার্জির মন।

পোচখানেওয়ালা সম্প্রতি আমাকে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করেছে সেক্সপীয়র কোট করে। There is a tide in the affairs of men…' এইরকম বোধহয় লাইন আবৃত্তি করেছিল। অর্থাৎ আমার জীবনের জোয়ার এসেছে, সেই জোয়ার ধরতে হবে এবং জোয়ারের টানে আমি দিল্লীতে আমাদের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পলিথিন ইউনিটে গিয়ে উঠব, কিছুই অসম্ভব নয়, হয়ত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার পর ওয়ার্কস ম্যানেজারও হয়ে যেতে পারি। পোচখানেওয়ালা মাঝে মাঝে সমাজতাত্ত্বিক কথা বলতে ভালবাসেন। বলেছিলেন, 'বাঙালীদের মধ্যে দুটো ট্রেণ্ড আছে—একটা বোমা মারার ট্রেণ্ড, কবি হওয়ার ট্রেণ্ড,—আর একটা অফিসার হবার ট্রেণ্ড।' আমি তাঁর মতে দ্বিতীয় বিভাগের লোক।

মাঝে মাঝে ভাবছি, কলকাতা থেকে পালাই। যে স্বপ্ন আমার সমস্ত যৌবন রাঙিয়েছে, আমার শহরতলীর নোংরা রক্তক্ষয়ী দরিদ্র অস্তিত্বকে এক সৌরজগতে দাঁড় করিয়েছে সেই স্বপ্নের মৃত্যু তো আমার পাশেই। এখন আমাকে এই স্বপ্নের মড়া বয়ে নিয়ে যেতে হবে সারাজীবন, এই ভয়ঙ্কর ভবিতব্য আমাকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তোলে। আমি আড়চোখে সূর্যের দিকে চাই। দুচোখ খুলে আকাশের দিকে চেয়ে

আছে সূর্য। পাশে তরুণটির হাতে ধূমায়িত সিগারেট।

তরুণটি হঠাৎ সিগারেটটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'চলুন, চলুন সূর্যদা। আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

'যাব? কোথায়?' সূর্য যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

'চলুন, আমাদের ওদিকে আবার সন্ধের পর বাস বন্ধ,' তরুণটি তাড়া দেয়।

সূর্য হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে। ঘুমের মধ্যে থেকে বলে ওঠে, 'চলুন। চলুন।'

কলকাতায় যা অভাবিত ব্যাপার তাই ঘটল সেদিন। গেটের সামনেই অপেক্ষমান ট্যাক্সি। আমার চেয়ে তরুণটি অনেক কেজো, অনেক কম অভিভূত। সে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে পথ নির্দেশ দিয়ে যেতে লাগল। আমি সূর্যের হাত ধরে বসে ছিলাম। আমার স্বপ্নের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম মনে মনে। বোধহয় আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল বুঝতে পারি নি।

সূর্য হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে আগের মতো বললে, 'মন শক্ত করুন।'

আমি আরও বোকার মতো নীরবে কাঁদতে লাগলাম।

হাসপাতালে ঢুকতে গিয়ে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। একজন ভদ্রমহিলা চেঁচাচ্ছেন, 'আমাকে জোর করে আপনারা পাগল বানাবেন? আমি পাগল নই বলছি, তবুও জোরজার করবেন। গায়ে হাত তুলবেন!'

আমি ভাড়া চুকোচ্ছিলাম, পেছনে ফিরেই দেখি তুলকালাম কাণ্ড। সূর্য মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হাসপাতালের দুটি কর্মচারীর ওপর। প্রচণ্ড বেগে ঘুসি চালিয়ে একজনকে ধরাশায়ী করল আমার চোখের সামনে। হাসপাতালের অন্য তিন-চারজন কর্মচারী দৌড়ে আসে। তাদের মধ্যে দুজন শক্তিমান। তারা সূর্যকে ধরে নির্দয় প্রহার শুরু করে। আমি ও আমার সঙ্গীটি থামাবার চেষ্টা করি। কিন্তু তার আগেই তার ঠোঁট কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। আমি হাতজোড় করে চেঁচাতে থাকি, 'পেশেণ্ট!

পেশেণ্ট !' ডাক্তারের চিঠিটা শূন্যে নাচাতে থাকি। সেই শক্তিমান পুরুষদের একজন বললে, 'পেশেণ্ট বলেই তো দাওয়াই দিলাম। ডাক্তারদের ওষুধে কিছু হয় না।' খাকি শার্টের কলার ঝাড়তে ঝাড়তে বললে।

সূর্য ব্যানার্জি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। আমি রুমাল দিয়ে তার ঠোঁট চেপে ধরি।

আমার সঙ্গীটি ডাক্তারের চিঠি নিয়ে ভেতরে গিয়েছিল। ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই সেই দুজন খাকি শার্টপরা শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হল। আমার দিকে চেয়ে একজন বললে, 'কিছু ভাববেন না, ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিলেই সেরে যাবে।'

সূর্য করিডোর দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমার যৌবনও তার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল করিডোর দিয়ে। এখন আর জীবনের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা নেই।

'একটা সিগারেট খান,' সঙ্গীটি বললে।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

১৩

বিনতাকে আমি বলেছি, আমার রিসার্চের কাজের যে খসড়া পেশ করেছি তাতে অফিস খুব খুশি। দিল্লী যাওয়ার সম্ভাবনায় সে আনন্দে প্রায় নাচছে। বলতে কি, এই সম্ভাবনাটা তাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে নইলে গত দু তিন মাস আমাদের এলাকা দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল তাতে বিনতাকেও বোধহয় লুম্বিনীতে পাঠাতে হত।

ছেলেটাকে টিকে দেওয়ার পর জ্বর হয়েছিল। আজ সারাদিন গতরাত্রের অনিদ্রাজনিত অস্বস্তিতে কেটেছে। বিনতা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে শুয়েছে। আমার আর কিছুই করণীয় নেই। টেবিল ল্যাম্পের আলোর আওতার বাহিরে জানলায় যে তারাভরা অন্ধকার সেদিকে শুধু চেয়ে থাকতে ভাল লাগছে।

তারার আলোয় আমাদের সামনের রাস্তাটা যেটা গঙ্গায় গিয়ে শেষ হয়েছে তাঁর বাঁক পর্যন্ত বেশ নজরে আসে। এই রাস্তাটা আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ইংরেজরা যখন বিদায় নিল তখন নিতান্ত বালক বয়সে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা কাঁধে প্রভাত ফেরী করতে বেরোতাম। বয়ঃসন্ধিকালে কমবয়সী মেয়েছেলের ভেজা-গা দেখতে দাঁড়াতাম সুধীরের দোকানের পাশে। শীলেদের বাড়ির নীচতলায় যে পাবলিক লাইব্রেরী, যেটা উপিরা পুড়িয়ে দিয়েছে সেখানে যেতাম শরৎচন্দ্র পড়তে। দাঙ্গার সময় সূর্য ব্যানার্জির নেতৃত্বে পাহারা দিতাম শিমূল গাছের গায়ে একতলা বাড়িটার ছাতে, যা এই অন্ধকারেও ঠাওর হয়। তারপর সূর্যের সঙ্গে কার্তিক ক্যাবিনে কিংবা এই ঘরে বসে আড্ডা। সর্বক্ষণ এই খোয়াওঠা গঙ্গামুখী রাস্তাটা যা আশেপাশের বাগানবাড়ির ঝাউ ও বটল পাম গাছগুলো কেটে ফেলায় এখন একেবারে হৃতশ্রী তা আমার সবসময় সঙ্গী ছিল। এই রাস্তায় ধর্মপ্রাণ মানুষ, বিপ্লবী ফেরারী মানুষ, হোলির দিনে হল্লা, পুজোর কদিন তাসাবাজনার সঙ্গে তরুণদের নিতম্ব-আন্দোলন, আবার সন্ত্রস্ত সচকিত অফিস ফেরতা মানুষের গৃহ প্রত্যাবর্তন, বোমা ও

গুলির আওয়াজ, পুলিশের গাড়ি ও নির্জনতা—এই সব নিয়েই এক অসংলগ্ন কাব্যের মতো এই রাস্তাটা যেন শুধু গঙ্গায় নয় আমার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

কিন্তু একদিন আমি এই রাস্তাটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়েছিলাম। চোখ বন্ধ করে অনুশোচনায় জ্বলেছিলাম, কেন পোচখানেওয়ালার কথা শুনে দিল্লী পালিয়ে যাইনি? সেদিন এই রাস্তাটা আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কেন বাঁচলাম তা আমি ব্যাখা করতে পারি নি, আজও পারি না।

সূর্য ব্যানার্জিকে হাসপাতালের গারদে দেবার বোধহয় দিন দশেক পরের ঘটনা। ইতিমধ্যে আমি ডাক্তার গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আমাকে কতগুলো সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য যেমন ফ্রয়েড, য়ুং, অ্যাডলার সম্পর্কে বললেন। তাছাড়া আরও কতগুলো মনস্তাত্ত্বিক টার্ম, যেমন হ্যালুসিনেশান, ডিলিউশান, সাইকিক ডিটারমিনিজম, রিপ্রেশান, রেজিসট্যান্স, ট্রান্সফারেন্স এগুলোও আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। কিন্তু চেতন ও অবচেতনের এই আবহমানকালের সংঘর্ষ, যা প্রচণ্ড তীব্রতা পেয়েছে সূর্য ব্যানার্জির ক্ষেত্রে, তার কোন আশু সমাধান আমি দেখতে পারলাম না। এইসব টার্মগুলো যেন মন্ত্রের মতো বলা হয়, কোথাও কোথাও হয়ত লেগে যায়। কোথাও কোথাও লাগে না। ডাক্তারবাবু বললেন যে, আমার বন্ধুটি খুব সেয়ানা পাগল, সে আবার উল্টে ডাক্তারকে প্রশ্ন করে। মনোবিকলনের পদ্ধতিটা সে আগাগোড়া ভেস্তায়। কাজেই শেষপর্যন্ত ইলেকট্রিক শক ও ট্রাঙ্কুলাইজারই ভরসা। কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় নি।

বোধহয় তখন বেলা বারোটা বাজে। বিনতা হাসপাতাল থেকে সবে এসেছে। ছুটির দিন। বিয়ের পর আমার রান্নার দিকে একটা প্রবণতা গজিয়েছে। শুকনো কারি করব বলে মাংসে মশলা মাখাচ্ছি, এমন সময় কার্তিক ক্যাবিনের ছোট ছেলেটা চীৎকার করতে করতে এল, 'গোমুদা, গোমুদা, মানিকদাকে মেরে ফেলেছে। আমি নিজের চোখে

দেখেছি। ধড় আর মুণ্ডু আলাদা, ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে আনছে।' বিস্ফারিত চোখে বললে, 'সূর্যদার পার্টির সাবাইকে মেরে ফেলেছে। এদিকে আসছে। আপনি পালান বৌদিকে নিয়ে।' যেরকমভাবে এসেছিল তেমনি দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে গেল।

আমি স্থাণুর মতো বসে থাকি। নড়বার ইচ্ছে হয় না, আর নড়ব কোথায়? লুকানোর কথা একবার মাথায় আসে। কিন্তু বিনতা, শিশুসন্তান? একটা অদ্ভুত চিন্তা বারবার আমার মাথায় চেপে বসে। আমাদের জলের ট্যাঙ্কে যদি গলা ডুবিয়ে বসে থাকি? আবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আতঙ্ক দেখা দেয়। আক্রমণকারীরা যদি আর কিছু না করে লোহার ডালাটা আটকে দিয়ে চলে যায়। নিজেকে একটা শ্বাসরুদ্ধ শীতল অন্ধকারে কল্পনা করে আঁতকে উঠি। চোখ বুঁজে আসে।

একটা প্রবল চীৎকারে আমার তন্দ্রা ভাঙে! শিমুলগাছ থেকে তুলো হাওয়ায় ভাসছে। তার নীচে হুটো ঠেলাভর্তি লাস চলেছে গঙ্গায়। পেছনে বল্লম পাইপগান হাতে বিশাল জনতা। সামনে কিছু বয়স্ক লোক যাদের দেখে আমি চমকাই। যাঁরা পুরুষানুক্রমে যখন-যেমন তখন-তেমন এই পন্থা গ্রহণ করে এই অঞ্চলে রাজত্ব করে আসছেন। সবচেয়ে অবাক হই তাদের মধ্যে সুকুমারকে দেখে। সুকুমার বোস আমার স্কুলের সহপাঠী, এখন এ অঞ্চলের গণ্যমান্য লোক, কোন সিনেমা হলের মালিক। সুকুমার আমাকে কেন বাঁচিয়ে দিল এখনও জানি না। স্কুল পালিয়ে আমরা হিন্দি ছবি দেখতাম এবং সেই বয়ঃসন্ধিকালে হুজনেই স্থির করেছিলাম হিন্দিছবির কোন প্রিয় নায়িকাকে বিয়ে করব। কৈশোরের সেই স্মৃতির তাড়নায় তাড়িত হয়েই কি সুকুমার আমার প্রাণ বাঁচাল?

আমার চারপাশে তখন অনেক কিছু ঘটছে কিন্তু আমার চোখ কান বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ তৃতীয় পক্ষের মতো আমি যা ঘটছে তাই দেখছিলাম। মুণ্ডু আর ধড় আলাদা হয়ে থাকলে বুঝতে অসুবিধে হয় টের পেলাম। মানিক দাস সুধীর মিস্ত্রি এদের ঠিক চিনতে পারি নি।

সুধীর মিস্ত্রির দোষ তার কারখানায় উপিদের পার্টির ছেলেদের আত্মগোপনের অভিযোগ ছিল। বিনতার চিৎকারও আমার কানে আসে নি। বিনতা চুলখোলা অবস্থায় আমাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করছে। চাপা গর্জন শুনতে পাই, 'সূর্য ব্যানার্জির দোস্ত, কদ্দিন লুকিয়ে থাকবি মাইরি?'

আমাকে কোন কিছুই আশ্চর্য করে নি সেদিন একজন ছাড়া। সে হল সুকুমার বোস। রক্তাক্ত বল্লম ও চপার হাতে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য করে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলে। আমি যে আসলে তার পার্টির সমর্থক এবং সূর্য ব্যানার্জির খবরাখবর নেবার জন্যেই আমাকে রাখা হয়েছে ঐরকম দুর্দান্ত মারমুখী জনতার সামনে সে শুধু ঘোষণাই করলে তাই না, তাদের ফিরিয়ে দিলে। অনেক পরে তার প্রতাপের কারণ টের পেয়েছিলাম। সে এখন আর আঞ্চলিক গণ্যমান্য লোকমাত্র নয়। সমাজের ওপরতলার লোকজনদের এই সমস্ত এলাকার প্রধান এজেন্ট। জয়ধ্বনি ও স্লোগান দিতে দিতে জনতা ফিরলে সুকুমার ফিরে আসে। তার টাক ও নাদুসনুদুস শরীরে আরও বয়স্ক লাগে। 'এক্ষুনি বেরিয়ে যা বৌ ছেলে নিয়ে। ওরা আবার আসবে। এখন আর তিনমাস এদিকে নয়।' যাবার মুখে ফিরে দাঁড়াল সুকুমার। আমার দিকে চেয়ে বললে, 'চারদিকে গণ-অভ্যুত্থান চলছে। আজ সারারাত, কাল সারাদিন চলবে। যদি বাঁচতে চাও, বেরিয়ে পড়।'

আমি এতক্ষণ দেখি নি। বিনতা ছেলে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে সুটকেশ। তার শরীর কাঁপছে। সুকুমার বেরোতেই চীৎকার করে উঠল, 'বসে বসে কী ভাবছো? বন্ধুর মতো তুমিও পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

আমাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে বার করে নিয়ে আসে বিনতা। আমি বললাম, 'দাঁড়াও, একটা চাবি দিয়ে যাই।'

'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। দিল্লী চলো। আমরা দিল্লী চলে যাই।'

সেদিন আর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল, শ্বশুরমশাই তাঁর ট্যাক্সি

নিয়ে বেরোন নি। যখন আমাদের এলাকা থেকে বেরিয়ে আসছি তখনও হল্লার আওয়াজ কানে আসছে। আর কানে আসছিল ফিডিং বটল থেকে দুধ খাওয়ার চুকচুক শব্দ। বিনতার চোখে আতঙ্ক কাটে নি। আমি তার কোমর জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আর ভয় নেই, বিনু।'

বিনতা বললে, 'আমি আর কখনও ফিরে আসব না।'

আমি তার কথাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে বলি, 'তা কি হয়। আবার আসব।'

কদিন পর অফিসের ঠিকানায় একটা হলুদ খাম পেলাম। আমাদের অঞ্চলের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত শান্তি কমিটির সভায় নিমন্ত্রণ। সভাপতি সুকুমার বোস। খামের উপর লাল বাহারে হরফে লেখা :

মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমাংস্তু সূর্য্যঃ।
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥

১৪

হাসপাতালে একমাস পর সূর্য ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ মঞ্জুর হয়। তার মা ও গৌরীই দেখাসাক্ষাত করে। সূর্যের মা বললেন যে বাহিরের লোকজনের সঙ্গে সে দেখা করতে চায় না। এই মহিলাটিকে আমার দেশমাতৃকার চিত্রকল্প বলে মনে হয়। বড়ছেলে সূর্য, দ্বিতীয় ছেলে সম্প্রতি জেলখানায় মারা গেছে, ছোটছেলেও জেলে বোধহয় মৃত্যুর অপেক্ষায়। সূর্য মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় যে জগতের হ্যালুসিনেশান দেখছে সেই হ্যালুসিনেশান ছাড়া মানুষের কী আছে? কিছু সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য আছে যেমন মার্কস লেনিন মাও সে তুং গান্ধীজি নেতাজী। এবং এই ফর্দ দেশে দেশে টেনে লম্বা করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষেব কাছে এই স্বপ্ন এই মায়াই কি সবচেয়ে বাস্তব ঘটনা নয়?

আমি যেমন এই মায়ার আকর্ষণে দিল্লী যাওয়া নাকচ করেছি। আমি এটা স্পষ্ট বুঝেছি এ আমার স্বার্থত্যাগ নয়। সততার পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন নয়। আমার নিজেকে শুধু স্বীকার করা, আমি বংশী মিত্তির যা, তাই বুঝে মেনে নেওয়া। সোনা আমাকে এই কথাটাই শিখিয়েছে। সোনা আমাকে শিখিয়েছিল, এই খোলা ড্রেন, খাঁচার পশুব মতো ঘামে জবজবে মানুষের বাসে যাওয়ার অবর্ণনীয় কষ্ট, ঘরে ঘরে বেকার ছেলের হল্লা আর মেয়েদের স্বাভাবিক জীবনের অভাবে বুকচাপা কষ্ট—এই সোনার বাংলাব সঙ্গে মানুষের আবহমানকালের বাংলাদেশের সৌরজগতের এক গভীর সম্পর্ক আছে। সেইজন্যে পাগলের হ্যালুসিনেশান অথবা কবির স্বপ্ন অনিবার্য। তাছাড়া আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই।

পোচখানেওয়ালা আমাকে ডিনারে ডেকেছিলেন তাঁর বাড়িতে। মিসেস পোচখানেওয়ালা আমার জন্যে কাসটার্ড পুডিং করেছিলেন নিজের হাতে কারণ বাঙালীরা মিষ্টি খেতে ভালবাসে। পোচখানেওয়ালা বললেন, 'দেখো মিত্তির, তোমাকে একজন হার্ড প্র্যাকটিক্যাল ম্যান্ বলে আমি

রেসপেক্ট করতাম। কিন্তু তুমিও যে শেষপর্যন্ত কবি, এটা আমি বুঝতে পারিনি। কবিদের নিয়ে দেশ গড়া যায় না। তারা সোসাইটির অলঙ্কার নিশ্চয়। তাদের রেসপেক্ট করতে হয় কিন্তু তাদের মেনে নেওয়া যায় না।'

মিসেস পোচখানেওয়ালাও বললেন, 'তোমাদের মতো ইয়াংম্যানদের অ্যাসার্টিভ হতে হবে। নইলে পশ্চিম বাংলার কোন ভবিষ্যৎ নেই। তোমরা নিশ্চয় খোঁজ রাখো, সমস্ত ইণ্ডাস্ট্রি এখান থেকে উঠে যাচ্ছে। কে থাকবে বলো? এই মারদাঙ্গা ষ্ট্রাইক খুন—তোমাদের ভাষায় শ্রেণী সংগ্রাম—এগুলো চলতে থাকলে এখানে কে টাকা ইন্‌ভেস্ট করবে বলো?'

সারাক্ষণ তারা স্বামীস্ত্রী আমার কানের কাছে এক সুন্দর ডুয়েট বাজাতে থাকেন, যে ডুয়েটের একমাত্র লক্ষ্য আমাদের দিল্লী ইউনিটে আমার যোগদান। পোচখানেওয়ালা বললেন, 'কমিউনিস্টদের আমি চিনি। সাম অফ দেম্ আর রিমার্কেবল ক্যারেক্টার্স। তারা যদি স্থির করে কেরীয়ার করবে দে ক্যান্ রাইজ টু দ্য টপ।' কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকজন নামজাদা লোকের নাম করলেন। আমি বললাম, 'দুদল কমিউনিস্ট আছে। একদল জেতার কমিউনিস্ট আর একদল হারার কমিউনিস্ট। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকজনদের শ্রদ্ধা করি।'

'তার মানে তুমি কমিউনিস্ট নও। তুমি পোয়েট, ইণ্টেলেকচ্যুয়াল। তোমাদের জন্যেই পশ্চিমবাংলা ধ্বংস হয়ে যাবে।' পোচখানেওয়ালা খানিকটা উত্তেজিতভাবেই বললেন।

আমি বললাম, 'আমি জানি না আমরা পোয়েট কিংবা ইণ্টেলেকচ্যুয়াল। শুধু জানি, যদি পশ্চিমবাংলা বাঁচে তাহলে তা আমাদের জন্যেই।'

বলবার সংগে সংগে মনে হচ্ছিল আমার প্রিয় সখা আমার মুখ দিয়ে তার কথা বলাচ্ছে। আমি সেদিন খেপেই গিয়েছিলাম। বললাম, 'এই শহরটাকেই ছাখো না। তোমরা কী করলে! এখানকার সমস্ত ইণ্ডাস্ট্রি তোমাদের অসম কম্পিটিশানে ভেঙে দিলে। তিলে তিলে এই শহরের

যা কিছু স্বাচ্ছন্দ ছিল সেগুলো, সমস্ত পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি তছনছ করে দিলে। আমাদের ছেলেদের হাতে বোমা তুলে দিলে কারা? তোমরা। এখন এসেছো, শ্মশানে ফুলগাছের চারা পুঁততে। আর এই শ্মশানের ঠিকেদারীতে আমাদের অনুৎসাহ হলে তোমরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো, আর যতো বস্তাপচা বুলি আওড়াতে থাকো তোমাদের ম্যাসমিডিয়াগুলো দিয়ে।'

'মিত্তির, তোমার এই সাইডটা আগে কখনও দেখিনি,' কাসটার্ড পুডিং খেতে খেতে পোচখানেওয়ালা বললেন।

'দেখলে বোধহয় ডিনারে নেমন্তন্ন করতে না।' আমি বললাম।

এরপর আমাদের মধ্যে কিরকম ব্যবধানের পর্দা পড়ে যায়। স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে থাকেন এমন সব বিষয় যেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ। বোধহয় বলবার আর দরকার ছিল না, তবুও বললাম, 'দিল্লী ইউনিটে দিল্লীর ছোকরাদেরই একজনকে তুমি রেকমেণ্ড করো। ওরা বেশ ঝাড়াঝাপ্টা, ওদের কোন স্মৃতির হ্যাং-ওভার নেই।'

স্বামীস্ত্রী দুজনেই মৃদু হাসলেন।

সেদিন সারারাত দাপিয়ে কাঁপিয়ে বৃষ্টি হবার পর রোদ্দুর উঠেছে। সুধীরের এক ছোটভাই অনেকদিন পর দোকান খুলেছে। মেঘলা আকাশের নীচে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে রাস্তার কোণে জমা জল ছিটকাচ্ছে। ছুটির দিন। আমি ভাঁজকরা হলদে কাগজখানা পড়ছিলাম। মাঠে গাছে রাস্তায় নয়ানজুলিতে মৌসুমি মেঘ যখন ঝরে ঝরে পড়ে, কচি কচি ছেলেমেয়েদের দৌড়ানোয় ছপাৎ-ছপ শব্দ তোলে ভালবাসা। ভালবাসা আকাশের নীলে, বনস্পতি সবুজে, মেঘে বজ্রে বিদ্যুতে···এমন কি অমাবস্যার অন্তহীন আঁধারেও ভালবাসা।

পায়ের শব্দ পাই। বিনতার খুব সকালে চান করার অভ্যাস। ভেজা চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'তুমি কিন্তু তোমার বন্ধুকে একবার দেখে এসো।'

কোন কোন স্ত্রীলোকের সন্তান হবার পর চেহারা ধ্বসে যায়। বিনতার খুলেছে। এক সতেজ শারীরিক দীপ্তিতে সে আজকাল ঝলমল করে।

'সে বাহিরের কারুর সংগে দেখা করতে চায় না।'

'একবার যাও না। অনেকদিন তো হোল।'

সেদিন হাসপাতালে যাবার মুখে আবার বৃষ্টি। আমি ইতিমধ্যে ডাক্তার গাঙ্গুলীর সংগে দেখা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ভাল হবার সম্ভাবনা যে নেই, তা নয়। কিন্তু কোন রকম টেনশান্ সহ্য হবে না। তার নিজের মনের জগতে তাকে থাকতে দিতে হবে। আমি আবার পোচখানেওয়ালার সংগে দেখা করেছিলাম। তিনি সূর্যের কেসটা জানতেন। আমাদের হাজারিবাগের ইউনিটে তার কোন চাকরি হবার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করতেই বললেন, 'অসম্ভব! ওখানে ছুটো লাগাতার হয়ে গেছে। ওখানে গেলেই তো ওদের নেতা হয়ে যাবে। তখন আবার একটা নার্ভাস কল্যাপস। তারচেয়ে···'

তারচেয়ে সে উন্মাদাগারেই পচুক। আমি আরও কিছু এদিক ওদিক ভেবেছিলাম। আমার একটা ধারণা হয়েছিল, সমুদ্রের ধারে কিংবা পাহাড়ে এক নাগাড়ে যদি কিছুদিন রাখা যেত তাহলে হয়ত সোনা সেরে উঠত তাড়াতাড়ি। সোনার মাকেও বলেছিলাম। তিনি কোন জবাব দেননি। তাঁর সেই ভাষাহীন চোখ ছুটো শুধু গেঁথে রইল আমার মনের মধ্যে।

আমাকে দেখে সোনা বললে, 'আমি ঠিক বলিনি? বলুন, সমস্ত পৃথিবীর চেহারা একমাসে কেমন পাল্টে যাচ্ছে, আরও যাবে। আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি।'

আমি তাকে চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে সজাগ করবার একটু চেষ্টা করেছিলাম, তার মায়ের কথা, তার ভাইয়েদের কথা, আমাদের পাড়ার কথা। কিন্তু সূর্য ব্যানার্জি সত্যিই এখন এমন এক সৌরজগতের অধিবাসী যেখানে চন্দ্র সূর্য তারার আলো বোধহয় অন্যরকম। অনেকক্ষণ ধরে

আমি এক ভবিষ্যতের গান শুনলাম। আমাদের পশ্চিমবংগ, বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা সর্বত্র এই বিংশ-শতাব্দীর শেষে একটা পতাকাই উঠছে পতপত করে—ভালবাসার পতাকা। সত্যিই ভাববাদ ও বস্তুবাদের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে, আর ঘটেছে সমাধান টেকনলজি ও প্রকৃতির নিরন্তর দ্বন্দ্বের। সোনা মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে, 'মানুষ বুঝেছে, তাকে নতুন কিছু করতে হলে তাকে নিজেকেই নতুন বানাতে হবে।'

যে অ্যাসিস্টেন্টটি অনতিদূরে এতক্ষণ টেবিলে বসে লিখছিল সে উঠে এসে বললে, 'আপনি রোগীকে বড় বকাচ্ছেন। ওঁর বেশী কথা বলা বারণ।'

সোনা প্রতিবাদ করতে যায়। আমি উঠে পড়ি।

বাহিরে চেপে জল নেমেছে। দেখি সোনার সেই তরুণ সঙ্গীটি, যাকে হাসপাতালে প্রথম দিন সোনাকে নিয়ে আসবার সময় দেখেছিলাম, সেও ভিজিটারদের মধ্যে ছাতা হাতে। জল এলে আমাকে তার ছাতার নিচে যাওয়ার জন্য ডাকলে।

কপেক পা এগোতেই চারদিকের আবহাওয়া দেখলাম কেমন থমথম করছে। দোকানপাট সব বন্ধ। শুনলাম পুলিশের গুলি চলেছে কিছুক্ষণ আগে।

আর একটু হাঁটার পর বৃষ্টি ধরে যায়। এবার আমরা দুজনে দুদিকে যাব। আমি বললাম, 'সব কিরকম ওলোটপালোট হয়ে গেল—না?'

সঙ্গীটি জবাব না দিয়ে বললে, 'একটা সিগারেট খান।'

আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

———